সৃজনী

৪ ভূপেন বোস এভিন্যু, কলিকাতা ৭০০০০৪

ফোন ৫৫-৪৬১৬

NATAJANU

a novel

by Chitta Sinha

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ চিত্ত সিংহ

রচনাকাল ঃ ১৪ মার্চ ১৯৬১

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৭৮

প্রকাশক ঃ সৃজনী'র পক্ষে অসীম রায়
৪ ভূপেন বোস এভিন্যু, কলিকাতা ৭০০০০৪

মুদ্রক ঃ সত্যনারায়ণ প্রেসের পক্ষে হরিপদ পাত্র
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা ৫০০০০৬

…………চিত্ত সিংহের পরবর্তী উপন্যাস ঃ বারোমাস্যা……… …

অনাদি মণ্ডল

সুহৃদ্বরেষু ।

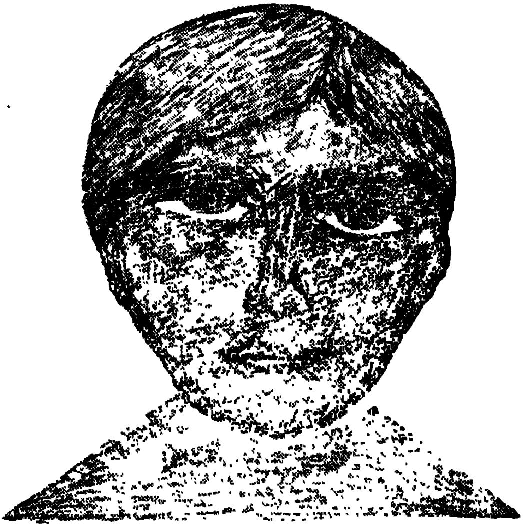

নতজানু • আদিপর্ব

০

আমার বিত্তবান পিতার আকস্মিক মৃত্যু হলে, হতচকিত আমরা, আমি ও আমার মা, যথারীতি দাহকর্ম শেষ করে বাড়ি ফিরতেই দেখি, শ্মশানযাত্রী ছাড়াও অসংখ্য শুভার্থী আমাদের প্রতীক্ষায়। তাঁদের অবিরাম সান্ত্বনাবাক্য ও শোকোচ্ছ্বাসে আমি প্রীত, ক্লান্ত ও বিরক্ত হবার মুখে, মা আচমকা আমার হাত ধরলেন,—তখনো মার চোখে অনর্গল জলধারা : খুব মৃদুস্বরে বললেন, একবার ভেতরে আয়।

আমরা যথারীতি অগ্নি ও লৌহ স্পর্শ করে, তেতো মুখে দিয়ে ঘরে পা দিলুম, অবশ্য ক্লান্তি ও বিরক্তি তখনো আমার মুখে চোখে, তবু নিরুপায় আমি, আমার মনোভাব যথাসাধ্য আড়াল করে, যা আমার পক্ষে একান্তই অস্বাভাবিক, আমি মার কথা শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হলুম।

সদরের মুখের ভিড় ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকতেই, মা, আমার হাত আরো জোরে চেপে ধরে প্রায় কানে কানে বললেন, যে যাই-ই বলুক, সোনা আমার, তুই শুধু শুনেই যাবি, কোন কথা দিবিনে।

মানে ? আমি জোর করে হাত ছাড়াতে চাইলুম।

মা আরো জোরে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, মানে আমরা যা-কিছু করব, খুব ভেবে-চিন্তেই করব।

মার কথা বলার ভঙ্গী আমার তেমন ভালো লাগল না। তবু নিরুত্তাপ শুধলুম, কি প্রসঙ্গে বলছ ?

তোর বাবার শ্রাদ্ধ-শান্তি অথবা অন্য যা-কিছুই হোক।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে নিলুম। বিরক্তি লাগছিল।

মার চোখে জল থাকা সত্ত্বেও কথাগুলোর মধ্যে মার সন্দেহ ফুটে বেরোচ্ছিল, যে সন্দেহের আগুনে বাবা আমরণ দগ্ধ হয়েছেন। মার এ-রোগ আমার জানা। আমি আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে সদরের ভিড়ে এসে দাঁড়ালুম। মনে হল, এসব কথা মা এ মুহূর্তে না বললেও পারতেন, তবু মা বললেন। মার নির্মমতায় আমি বিস্মিত হলুম, ক্ষুব্ধ। ভাবলুম, বাবা আ-মৃত্যু অমানুষিক পরিশ্রম করে, পদে পদে কৃপণতার প্রশ্রয় দিয়ে এত যে অর্থ-বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন, সে কার জন্যে? তাঁর দিন-রাত্রির অন্তহীন পরিশ্রমের এই-ই কি পরিণাম?

আমি আরো কিছু বিশ্রী ভাবনার দিকে মরীয়া হয়ে ছুটে যাচ্ছিলুম, নতুন কারা এসে একরাশ কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

চোখ তুলে তাকাতেই দেখি, মায়ের বাপের বাড়ীর লোকজন, আমার মামী, মাসীরা।

আমি ওঁদের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েও থেমে গেলুম, এমন কি, কোন কথা না বলে ঠায় গোঁয়ারের মতো দাঁড়িয়ে থেকে শুধুই তাকিয়ে রইলুম। যাঁরা আমায় ঘিরে ছিল, তাঁরা পথ করে দিতেই বড় মাসীমা দৌড়ে এসে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, চোখে অঝোরঝরণ অশ্রু, মুখে অবিরাম শোকোচ্ছ্বাস। ভিড়ের কে একজন বয়স্ক—এত দেরীতে এলে—এমন একটা কথা শুধতেই, বড় মাসী তেমনি কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, পোড়া সংসারের জ্বালায় আমার কি মরার ফুরসুৎ ছিল। আমার মনে হল গলাটা পরিস্কার, কান্নার কফ জড়ানো নয়।

০

বাবার মৃত্যুতে আমি যে অনাথ, আমার মা যে অনাথা, তা একবারও মনে হয় নি। অথচ লোকে তাই-ই বলছিল। সে-সব লোকের কথা। বরং আমার মনে হয়েছে, এক বেয়াড়া, বদরাগী, নাছোড় পাহারাদারের খপ্পর থেকে ভগবান আমাদের রেহাই দিয়েছেন, চিরদিনের মত মুক্তি;

যা আমরা মুখে উচ্চারণ না করলেও, মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেছিলুম। এমন কি কোন কোনদিন ক্ষোভের মুহূর্তে পিতার অপঘাত মৃত্যু আমি ত বটেই, আমার সাধ্বী মাও প্রার্থনা করেছিলেন।

ঈশ্বর এত দ্রুত আমাদের কথা শুনেছেন, আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন দেখে আমি খুশি; সম্ভবতঃ মাও। নইলে সেদিন, সেই শ্মশান থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই গোপনে সতর্ক করে দেবার মানসিক স্থিরতা মার এল কোত্থেকে? তিনি কি তখন পিতার শোকে কাতর তথা মুহ্যমান ছিলেন না, যদি ধরেই নিই, তিনি শোকার্তা নন, তাহলে, তাঁর চোখের অফুরন্ত জলের তাৎপর্য? অমন আকুলি-বিকুলি কান্না ও লুটোপুটি? সবটাই কি অভিনয়?

হয়ত। হয়ত নয়। আমি সঠিক জানিনে, আন্দাজ করতে পারি মাত্র।

০

আমার তীব্র অনিচ্ছা জেনেও মা তিরিশদিন অশৌচ পালনের ফতোয়া দিলে, আমি প্রথমে বাবার মমতা ও প্রীতির কথা, যা কখনো কখনো আমাকে স্নিগ্ধ করেছে মনে করে, মানি মানব ভাবতে ভাবতে যখন তাঁর হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কথা মনে পড়েছে, অমনি আমি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললুম, একালে অতোদিন কেউ-ই পালন করে না মা, আমরা তেরোদিনেই শুদ্ধ হব। মা বিস্মিত, বিমূঢ়। ভাবটা এই, এ কাকে আমি গর্ভে ধরেছি? এ কে?

মা কাঁদলেন, জনে জনে ধরে দুঃখ করলেন, বললেন, কপালে এও ছিল! হায়রে! কালে কালে এত অনাচারও দেখতে হল ইত্যাদি সাত সতেরো।

মা বুদ্ধিমতী। সবাই বুঝলেন, তাঁর পাতিব্রত্যে কোন খাদ নেই; কিন্তু আমি কুপুত্র হিসেবে ধরা পড়ে গেলুম। অথচ তেরোদিনের দিন তিনিও যথারীতি শুদ্ধ হলেন। হাবেভাবে মনে হল, দায় কাটল। চোদ্দদিনের দিন আমার পুরোন মাকে স্ব-রূপে স্পষ্ট হতে দেখে

আমি একটুও বিস্মিত হলুম না।
কোথায় সেই মর্মান্তিক শোক, দিগন্ত বিদীর্ণ কান্না, এলোচুলের উন্দাম লুটোপুটি, কোথায় ঘন ঘন মূর্চ্ছা ও পতন, মা বাবার চেয়েও শক্ত হাতে বিষয়-বিত্তের হাল ধরে বসলেন।
পাহারাদারদের শূন্যতা নয়, নতুন পাহারাদারের নিরন্তর খবরদারীতে আমি চোখে অন্ধকার দেখলুম। এমনটি ত কথা ছিল না!

০

বয়সের হিসেবে আমি সাবালক-ই। আমার বয়স একুশ। অবশ্য আমার বয়সী অন্য দশজনের মতো হিসেবী বুদ্ধি নেই বটে, তার জন্য দায়ী বাবার অনাবশ্যক কঠোরতা ও মার আঁচলে গেরো দিয়ে রাখার মনোবৃত্তি—তবে একেবারে নির্বোধ এমন মনে করার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করিনে। নিশ্চয়ই যাঁরা এটুকু পড়েছেন তাঁরাও মনে করছেন না। কিন্তু আমার মা, আমার গর্ভধারিণী, জননী, সবকিছুতেই আমার নির্বুদ্ধিতা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন; ফলে বিরক্তি ও বিরোধের সূত্রপাত হল। দিন যত যাচ্ছে, আমার মনে হতে লাগল, মা আমাকে কিছুই ছাড়তে রাজী নন, এমন কি বিনা প্রশ্নে একটি কপর্দকও না; অথচ আমি ছাড়া মার একান্ত আপন বলতে আর কেউ-ই নেই। অবশ্য রক্ত-সম্পর্কে ধরলে মার বাপের বাড়ীর লোকেদের কথা ওঠে। সেখানে আমার তিন মামা, দুই মাসী, আরো কেউ কেউ আছেন। বাবার মৃত্যুর পরে তাঁদের গতায়াত লক্ষণীয় ভাবে বাড়লেও মা তাঁদের তেমন কোন খাতির করেন এমন জানা নেই। অথচ বাবা বেঁচে থাকতে, এই ভাই বোনেদের জন্যে, 'এই করে দাও, সেই করে দাও' বলে বাবাকে অহরহ উত্যক্ত করতে দেখেছি।
এমন ভয়াবহ অসহায়তার মধ্যে নিরুপায় আমি প্রাণপণে মার মৃত্যু প্রার্থনা করলুম। ভগবান কিছুতেই শুনছেন না দেখে আমি মরীয়া হয়ে উঠলুম।

০

আমি বন্ধু ভাগ্যে ভাগ্যবান। বাবার মৃত্যুর পরে তারা সংখ্যায় বেড়েছে।

বাবা ছিলেন নিঃসঙ্গ। তাঁর মুখই তাঁর নিঃসঙ্গতার জন্যে দায়ী। তবু ওই দুর্মুখ লোকটার আশেপাশে যাঁরা তাঁর কর্মের ও সিদ্ধান্তের সুখ্যাতি করে ঘুরঘুর করতেন, তাঁরা কেউ-ই বন্ধু ছিলেন না। তাঁরা উমেদার। তাঁদের কথা তিনি এ-কানে শুনে ও-কানে বের করে দিতেন। এমন কি মার সৎ যুক্তিও বাবা নিমেষে অগ্রাহ্য করতেন। অথচ, ঘরে তাঁর মনের কথা শোনার মতো লোক ছিলেন একমাত্র মা-ই।

ওঁদের বিবাহিত জীবন দীর্ঘ তেইশ বছরের, তবু বাবা মাকে আপন মনে করতেন না। তার কারণও ছিল।

মা বাবার আত্মীয়-স্বজনদের আদৌ পছন্দ করতেন না। ওদের উপস্থিতিতেই বিরক্ত হতেন। সে কি বিরক্তি! বলতেন, কি জন্যে এসেছিল? নিশ্চয়ই কিছু সাহায্য চাইতে?

বাবা জবাব দিতেন না। মা বলতেন, ওরা সবাই তোমাকে ঠকিয়ে পথে বসাতে চায়।

তাই নাকি! বাবা মাথা না তুলেই জিজ্ঞেস করতেন।

বাবা একবাক্যে সবাইকে দোষারোপ করা পছন্দ করতেন না; তাই খুবই বিরক্ত হতেন। কখনো কখনো রেগে বলতেন, তাই-ই যদি, তবে সে-কথা তোমার আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধেও সমান সত্য।

মা তাঁর রক্তের সম্পর্কের কারো সম্পর্কে এ ধরণের মন্তব্য একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। রেগে, চেঁচিয়ে, কেঁদে ফিরিস্তি দিতেন, কে কবে বাবার বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবাকে বাঁচিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। বাবা এ ধরণের কথাবার্তায় ক্ষেপে উঠতেন। এই ক্ষ্যাপামির সুযোগে মা অকথ্য এমন কিছু উচ্চারণ করতেন যে, যার ফলে বাবার সহ্যের সীমা ছাড়াত। এবং বাবা, এলোপাথারি লাথি চড় ঘুষি মারতে একটুও ইতঃস্ততঃ করতেন না। মাও সম্ভাব্য হাত পা চালাতেন। সে এক দৃশ্য

বটে ! একসময়ে মা অসহ্য যন্ত্রণায় ক্লান্ত হয়ে পড়লে, অথবা অজ্ঞান, বাবা থামতেন। দৌড়ে জলের ছিটে দিতেন চোখ-মুখে। ভয়ে, ঘৃণায় নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে নিজের চুল ছিঁড়তেন।

এমনি দিনে কারোর-ই খাওয়া হত না। সারা বাড়ি থমথম করত ভয়ে, উদ্বেগে। বাবা-মার বোঝাপড়া প্রায়শঃ রাত্তিরের মধ্যেই হয়ে যেত। কখনো কখনো পাঁচ সাত দিনও গড়াত। তখন বাবা গা ঢাকা দিতেন। কোথায় যেতেন কে জানে ! এসব ব্যাপারে আমার ভূমিকা ছিল নগণ্য। শুধু দূরে দাঁড়িয়ে গলা চিরে কাঁদা। তখন আমার বয়স কতো ? পাঁচ কি ছয়। আমার বারো-চৌদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত এসব ঘটতে দেখেছি। তখনকার সেই বেয়াড়া কান্নার জন্যে কখনো-সখনো কিল-চড়-লাথি আমার ভাগ্যেও জুটত। যেহেতু মার দুঃখ-যন্ত্রণা আমার থেকে বেশি, আমি আমার যন্ত্রণা তাড়াতাড়ি ভুলে যেতুম। কিন্তু সেই ভীষণ রাগের মুহূর্তে বাবার উচ্চারিত তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যগুলো কিছুতেই ভুলতে পারতুম না। তিনি যেদিন-ই ক্ষেপে যেতেন সেদিন-ই আমাকে এবং আমার মাকে একই সঙ্গে যমের হাতে তুলে দিতে চাইতেন, যাতে তিনি সহজে মুক্তি পান।

০

বাবার একজন রক্ষিতা ছিল।

আমাদের বাড়ীর এক রাঁধুনি ঠাকুর, যে আমাদের শহরের বাসায় থাকত, সে একদিন কথায় কথায় আমাকে বলেছিল, মার প্রতি বাবার ব্যবহার দেখে ক্ষোভে দুঃখেই বলেছিল, এবং সাবধান করে দিয়েছিল যাতে ঘুণাক্ষরেও একথা প্রকাশ না করি।

রক্ষিতা কাকে বলে আমি তখন জানতুম না, তাই সে কথা কাউকেই বলিনি। আমি সে কথা ভুলেও গিয়েছিলুম। কিন্তু বাবার মৃত্যুর মাসাধিক কাল পরে, আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা একটি ছেলেকে সঙ্গে করে শহর থেকে আমাদের বাড়িতে

এলেন।

তিনি সত্যিই সুন্দরী। যেমন গড়ন, তেমনি স্বাস্থ্য। চোখ পেতে দেখার মতো। আমার মা, রূপে ব্যবহারে তাঁর নখের যুগ্যিও নয়। তিনি আমাকে কাছে ডেকে বলেছিলেন, আমি সম্পর্কে তোমার পিসী হই, তোমার বাবাকে আমি ধর্ম-ভাই ডেকেছিলুম।

আমার হঠাৎ সেই রাঁধুনি ঠাকুরের কথা মনে পড়েছিল। আমি অপলক তার দিকে তাকিয়েছিলুম। ইচ্ছে হয়েছিল জিজ্ঞেস করি, এমন ধর্ম-ভাই আপনার কত আছে? ওর অমন চোখ ধাঁধানো রূপ ও চেহারার আভিজাত্য আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করিনি। বলতে বাধা নেই, মনে ঘৃণা হলেও, বাবার রুচির প্রশংসা না করে পারিনি। আমার তাকানোর ভঙ্গী দেখে, সে মহিলা বলেছিলেন, তুমি ঠিক তোমার বাবার মতো।

বাবার মতো কি, সে কথা আমি লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

মা ভদ্রমহিলা সম্পর্কে অচিরে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন এবং দিন কয়েক থেকে যেতে বার বার অনুরোধ করলেন, যা মোটেই মার স্বভাব-সম্মত নয়। ভদ্রমহিলা মার অনুরোধ এড়িয়ে সেদিন-ই ছেলেকে সঙ্গে করে চলে গিয়েছিলেন।

ছেলেটার বয়স বছর ষোল, মার মতোই সুন্দর দেখতে। না, বাবার মুখের আদল ওর মুখে ছিল না।

মহিলা চলে যেতেই মাকে জিজ্ঞেস করলুম, এ পিসীর কথা তুমি জানতে?

মার হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। আমার মৃত পিতার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে হাতের কাছে যা-কিছু পেলেন তাই-ই ভেঙেচুরে তছনছ করলেন। আমি বাধা দিইনি, শুধু দেখে গেছি। এবং বুঝলুম. মা এর কথা জানতেন।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, সে মহিলা যাবার আগে মার আড়ালে

আমাকে তার ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন। বার বার বলছিলেন, শহরে গেলে যেন এই অভাগী পিসীর ওখানেই উঠি, নিদেন দেখা করি। এবং এও বলেছিলেন, আমাকে দেখার জন্যে তার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, ভগবান তার সে আশা পূর্ণ করেছেন।

আমি তখন ছেলেটার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছে করলে, বললেন, ও কথা বলতে পারে না, ও বোবা।

মুখ, চোখ, হাবভাব দেখে আমার কিন্তু তা মনে হয়নি।

০

শুনেছিলুম আমার পিতামহের সাবেক বাড়ী ছিল দূরের এক গ্রামে। যাতায়াতে নাকি অনেক সময় লাগে, সেজন্যে, শুধু সেজন্যেই আমি কোনোদিন ওখানে যাই নি। আমার মাও কি গেছেন?

মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। জবাবে বলেছিলেন, তেমন কিছু আছে নাকি?

মানে?

মানে ওই। কিছু নেই তো যাবো কোথায়?

কেন ভিটে জমি?

কে জানে! মার রহস্যভরা এড়িয়ে যাওয়া আমার মনঃপূত ছিল না।

শুধলুম, বাবার আপনজন কেউ নেই?

নেই আবার! শ'য়ে শ'য়ে।

ওঁরা কোথায় থাকেন?

যত্রতত্র। মা কথায় ইতি টেনে কাজে চলে গেলেন।

বাবাকে জিজ্ঞেস করব সে সাহস কোন দিনই ছিল না। তবে একদিন কি এক কথায় কথায় একজনকে বলছিলেন, ছোট বেলায় মামার বাড়ীতে মানুষ। বেঁচে থাকতে বাবার ভালবাসা পাইনি। বড় দুঃখের জীবন আমার।

সে দুঃখের পরিমাণ ও পরিসর এই সেদিন অব্দি আমার জানার বাইরে

ছিল।

এখন আমরা যেখানে আছি এটা একটি মহকুমা শহর, জংশন স্টেশানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই আধা শহরে বাবার কিছু প্রতিপত্তি ছিল। এখানে কিছু ঘটলে সেই ঘটনায় বাবা সহজেই জড়িয়ে পড়তেন, এটা বাবার অপছন্দ ছিল না। সম্ভবতঃ ঐটুকুর জন্যে বাবা এখানে স্থায়ী হয়েছিলেন।

০

বাবার পড়াশোনার বেশ নেশা ছিল। প্রমাণ, বাবার গোপন পাঠাগার, যেটা চিলে কোঠায়, সব সময় তালাবন্ধ করে রাখতেন, এমন কি মাকেও ঢুকতে দিতেন না। আমি ভয়ে কোনদিন ওমুখো হইনি। মৃত্যুর কিছু দিন আগে কিছু কাগজপত্র উনি পুড়িয়েছিলেন। কি, তা কেউ জানতে পারিনি। শুনেছি, তিনি কলেজে ঢুকেছিলেন। সম্ভবতঃ পাশ দেয়া হয়নি।

তিনি এ ব্যাপারটা আড়াল করতেন।

বাবার মধ্যে অনেক জানার ও বোঝার একটা অহমিকা ছিল। লোকে তাঁর বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। চাপা স্বভাবের এই লোকটা চাইলে তেমন কেউ কেটা হতে পারতেন, এ বিশ্বাস আশে পাশের সবার-ই ছিল। কারণ পৈতৃক বিষয়-বিত্তহীন যে মানুষ শুধু নিজের চেষ্টায় দাঁড়াতে পারেন লোকে তাঁকে খাতির করতে বাধ্য। অবশ্য কি ভাবে দাঁড়িয়েছেন সে ব্যাপারে নানাজন নানা কথা বলতেন। তার মধ্যে ভালর চাইতে মন্দের ভাগই বেশী। বাবার এসব কানে আসত না তা নয়, কিন্তু তিনি শুনেও না শোনার ভান করতেন। বলতেন, এসবের প্রতিবাদ ও সমর্থনে কোন ফল হয় না। প্রতিটি মানুষের বিশ্বাস তার একলার। সে সব বদলাতে পারেন একমাত্র নেতা আর মোহান্তরা। আমি নেতা বা মোহান্ত নই।

বাবার শেষ কথাটা আমায় কানে লাগত, মনেও।

মোটামুটি হিসেব হলে দেখা গেল বাবার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য তিন লক্ষাধিক। ইনস্যুরেন্সের টাকা যদি ঠিক ঠিক আদায় হয় তাহলে আরো সত্তর-বাহাত্তর হাজার।

ব্যাঙ্কে যা সেভিংস হিসেবে আছে সে অঙ্ক নিত্যই বাড়ছে। হাত না দিলে ও বাড়বেই। এবং স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে—শহরের যে বাড়ীতে আমাদের বাসা ছিল, সেই তিনতলা বাড়ীতে আমরা ভাড়াটে নই, ওটা আমাদের বাড়ী, আমরা, আমি ও মা, ঘুণাক্ষরেও জানতুম না। ও বাড়ীতেও অনেক ভাড়াটে, আয় মাসে প্রায় দেড় হাজার। অর্থাৎ আমরা পথে নেই, আমাদের জন্যে অনেক রেখে গেছেন, এতে আমাদের মা-ছেলের ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ করে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু মার আক্ষেপ, ওর আরো ছিল, নিশ্চয়ই আছে।

এ কথা কেন বলছ?

আমার মন বলছে।

বেশ বললে! তোমার মন বললেই ত সম্পত্তি গজিয়ে উঠবে না। কোন প্রমাণ আছে কি?

মা হঠাৎ রেগে গেলেন। প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, মুখ করবি নে কথায় কথায়। যা মনে হচ্ছে তাই-ই ঠিক।

এই যাহ্! মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছিনে। বললুম, মানে?

মানে বেনামে আছে।

বেনামে? আমি আকাশ থেকে পড়লুম। তবু শুধলুম, কার নামে থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

কেন, ও মাগীর নামে।

কথাটা কানে যেন গরম সীসে ঢেলে দিল। মার মুখের আগল কোন দিনই ছিল না, কিন্তু এমনটি, আশ্চর্য!

আমি বিরক্ত চোখে মার দিকে তাকালুম।

কি তোর মন বলছে না?

আমি কি জবাব দেব? ইতঃস্ততঃ করতে করতে বললুম, বাবা যদি তেমন কিছু করেও থাকেন, সে ত প্রমাণ করা যাবে না।

ঠিকই দিয়েছে। মা আপন মনে বিড়বিড় করে বললেন। মেয়ে মানুষের অতো টান কি এমনি এমনি।

কি?

ওসব তুই বুঝবিনে।

বাহ্! তুমি ত সব খোলাখুলিই বলছো, না বোঝার ত কিছু নেই।

তোর সন্দেহ হয় না?

বাবার প্রতি আমার এমন এক ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা আছে যে আমার এসব গ্লানিজনক কিছু বিশ্বাস করতে মন চায় না। এতো যদি ক্লেদ থাকবে তা হলে উনি সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন কী করে? মানুষ ত আর অন্ধ নয়, বোবা-কালাও নয়। ও বয়সে এরকম একটা ধারণা আমার বদ্ধমূল ছিল।

আমি মার দিকে না তাকিয়ে বললুম, তোমার খুব সন্দেহ?

একশো বার। তেইশ তেইশটি বছর ঘর করেছি, আমি কি কিছু বুঝিনে মনে করিস?

তাহলে আমার বলা না-বলার কোন মানে হয় না। একটু থেমে যোগ করলুম, কিন্তু ওসব ভেবে মন খারাপ করে লাভ কি? আমাদের জন্যেও ত অনেক রেখে গেছেন।

তা হলে আর কি! এখন উড়ে পুড়ে খাও। আমি আর কদ্দিন? তুমি খুশি হলেই হলো!

কথাগুলো কেমম যেন গোলমেলে। ভেবেছিলুম জবাবে কিছু বলব না, কিন্তু কে যেন আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলে, আমার খুশি হবার কিছু নয়, তুমি সন্দেহের জ্বালায় জ্বলবে এটাই আমার খারাপ লাগছে।

আগুনে যেন ঘি পড়ল। দপ করে জ্বলে উঠলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বাপেরই বেটা তো! তুই সন্দেহ ছাড়া আর কিছু দেখবি কেন?

আমি কার বেটা সে তুমি-ই ভালো জানো।

কি ?

আশ্চর্য ! এ কথাগুলো কেন উঠল, কেনই বা জবাব দিচ্ছি বুঝতেই পারিনে। বললুম, তুমি ইচ্ছে করেই জট পাকাচ্ছ। শুধু শুধু—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, বাহ্, বাহ্, আমি ইচ্ছে করেই জট পাকাচ্ছি, তোরও তাই মনে হচ্ছে, না ?

পাকাচ্ছই তো !

আর যে জট পাকিয়ে গেল, সে ধোয়া তুলসী পাতা ? তাহলে ও মাগী এদ্দুর ছুটে এলো কেন ?

এ তোমার সন্দেহ। ভদ্রমহিলা বললেন না, ধর্ম ভাই ডেকেছিলেন ?

ধর্ম ভাই না আরো কিছু ! ও তোর সৎ মা। বলতে বলতে মা রাগে ক্ষোভে দুঃখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন।

মার ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার মনে হল, মা স্বাভাবিক নয়, মাকে ডাক্তার দেখাতে হবে।

আমি প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।

০

বাইরের ঘরে পা দিতেই একগাদা বন্ধুর মুখোমুখি। ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বেশ কয়েকদিন ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি ওদের দেখে উৎফুল্ল হতে গিয়েও গম্ভীর হয়ে গেলুম।

কি হয়েছে ? কে একজন শুধলে।

বললুম, বড় বিপদ, এখন তোরা যা, বিকেলে দেখা হবে।

ওরা কি বুঝল কে জানে, কথা না বাড়িয়ে একে একে ঘর থেকে চলে গেল।

আমি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বৈঠকখানা ঘরেই বসে রইলুম। হঠাৎ মুখ তুলতেই নজরে পড়ল দেয়ালে টাঙানো একটি ছবি বেঁকে আছে। বড্ড চোখে লাগছিল। উঠে ঠিক করতে গিয়ে হঠাৎ, হঠাৎ-ই নজরে পড়ল

ছবির পিছনে পেরেকে টাঙানো একটা চাবি !

কিসের চাবি ? কোথাকার চাবি ? এখানে ?

আমি চাবিটা হাতে নিয়ে ছবিটা ঠিক করে দিয়ে আবার এসে বসলুম ।

কোথাকার হতে পারে ?

হঠাৎ ঝিলিক খেয়ে গেল ।

আমি দ্রুত উঠে পড়িমরি সিঁড়ি ভাঙতে লাগলুম। ছুটতে ছুটতে ছাদে । সামনে চিলেকোঠা, তালা ঝুলছে । চাবি লাগাতেই তালা খুলে গেল । সামনে বাবার সেই গোপন পাঠাগার ।

এতো বই !

আবিষ্কারের ঘোর কাটার আগেই আমি পায়ে পায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলুম । সবকিছু নিখুঁত গোছানো ।

আমার চোখ হাঁটছে । দরজাটা হাট করে খোলা । সে কি !

আমি ছিটকিনি তুলে দিলুম ।

o

বাবার এমন একটি মন ছিল আমি ভাবতেই পারিনে । মার সঙ্গে বাবার ব্যবহার, যা আদৌ আমি সমর্থন করতুম না, যার ফলে আমার সহানুভূতি মার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, যে জন্যে বাবার প্রতি আমার ঘৃণা,—আমি ভয় করতুম, আমি প্রায়শঃ তাঁকে এড়িয়ে চলতুম ; যার ফলে কদাচিৎ আমার সঙ্গে বাবার দেখা হত, এবং বাবাও দায়ে না পড়লে আমাকে ডাকতেন না । এমন কি আমার আচার-আচরণ, আমার পড়াশোনা কিছুই তাঁকে তাতাত না ; অবশ্য পড়াশোনা, পোষাক-আষাক ইত্যাদির সমস্ত ব্যবস্থাই যথাযথ করতেন তাঁর কর্তব্য হিসেবে । এজন্যে আমার আব্দারের সমস্ত ধকল সইতে হত একলা মাকেই, তবু মার প্রতি আমার এক দুর্বোধ্য তাচ্ছিল্য ছিল, আছে—হয়ত মার ব্যক্তিত্বহীনতার জন্যে, হয়ত মার বাক্য ও ব্যবহারের অসংযমের জন্যে, মার প্রতি টান থাকা সত্বেও মা আমাব শ্রদ্ধার ভাগীদার নন ।

অথচ এই অমূল্য আবিষ্কার বাবাকে আরো শ্রদ্ধেয় করে তুলল। আমার মনে হল, আমার বাবা হতভাগা ছিলেন, নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব। এতো একাকীত্ব তিনি কি করে বইতেন? সম্ভবতঃ এই বই-ই ছিল তাঁর সান্ত্বনা। হয়ত বইয়ের বন্ধুত্ব মার দুর্মুখ সঙ্গলাভের দুর্বহ যন্ত্রণা থেকে তাঁকে মুক্তি দিত, অথবা উল্টো, একান্ত বই প্রীতিই মাকে দুর্মুখ করেছিল, দূরে ঠেলে দিয়েছিল।

বইয়ের নামগুলোতে চোখ রাখছি, ক্রমে বিস্ময় বাড়ছে। না, সময় কাটানোর উপকরণ এ নয়, নিশ্চয়ই অন্য কোন গূঢ় তাগিদ ছিল, অন্য কোন অভিলাষ। সে কি?

সেই খোঁজে তন্ন তন্ন করতে গিয়ে এমন কিছু কাগজপত্র ও খাতা হাতে এলো যে, যেগুলোতে প্রাথমিক চোখ বুলিয়ে মনে হলো, ও লোকটাকে আমি চিনিনে, চিনতুম না। এতো অপরিচয়?

অথচ কতো দীর্ঘকাল আমি এ মানুষটার ছায়ায় ছায়ায় বেড়ে উঠেছি। তিনি কি না যোগান দিয়েছেন! অথচ—

ভুল, ভুল, অমার্জনীয় অপরাধ। এ কি করে সম্ভব? মানুষ কি এতো দুরূহ, এতো দুর্বোধ যে দীর্ঘকাল সঙ্গ দেওয়া সত্ত্বেও অপরিচয়ের ব্যবধান ঘোচে না, ঘুচবার নয়? অথচ আমরা উচ্চারণ করি অবলীলায়, হ্যাঁ ওঁকে আমি চিনি। লোকটা ভীষণ…অথবা লোকটা খুব ‥

o

মার রোগ বৃদ্ধির দিকে। এতদিন কথায় অসংলগ্নতা ছিল, কিছু অকথ্য উচ্চারণ, কিন্তু ক্রমে লক্ষ্য করছি মার তাকানোর অস্বাভাবিকতা। কখনো কখনো চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে যায়, কখনো ক্রূরতায় ভীষণ, কখনো বা তাচ্ছিল্য ছিটকে পড়ে। এ দৃষ্টি যে স্বাভাবিক দৃষ্টি নয়, এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। এবং দৃঢ় ধারণা হল, মা ক্রমে পাগল হয়ে যাচ্ছেন।

আমি ডাক্তার নিয়ে এলুম।

মা শুধলেন, ডাক্তার এনেছিস কেন ?

তোমার জন্যে মা। কদ্দিন ধরে দেখছি তুমি—

খুব অসুস্থ, এই তো। মা রহস্যময় হাসলেন। একটু পরেই সেই ক্রূর কঠিন দৃষ্টি। তারপরেই মা অতি মাত্রায় স্বাভাবিক। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতটা ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, ভালো। তুই নিশ্চয়ই না বুঝে কিছু করছিস না? মার সেই তাচ্ছিল্য-ভরা হাসি।

ডাক্তারবাবু কিছু ওষুধ দিলেন।

মা একটুও বাধা দিলেন না। ওষুধ এগিয়ে দিতেই তেমনি হেসে গিলে ফেললেন।

মাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার ওষুধ দিয়েছিল। মা অঘোরে ঘুমুচ্ছেন।

o

আমি এখন স্বাধীন। যা আমি চেয়েছিলুম তা আমার হাতের মুঠোয়। আমি বয়স্ক কিছু ঝি-চাকরকে ছাঁটাই করে নতুন ঝি-চাকর রাখলুম। যে সরকার কাকা এদ্দিন আমাকে পাত্তা দেননি, তিনি নতমস্তকে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কাছ থেকে একে একে সব বুঝে নিলুম, এবং আমার পছন্দ মতো কাজ করতে বাধ্য করলুম। বয়স হয়েছে বলে হোক, অথবা আমার দৌড় পরখ করার জন্যে হোক, তিনি আমার অধিকার ও অধীনতা মেনে নিলেন। আমি খুশি। আমি জয়ী।

কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে আমার উৎসাহ নিবে গেল। এক হাজার একটি ঝামেলায় আমি নাস্তানাবুদ, বেসামাল। স্বাধীনতা যে বিশ্রাম-হীন আমার জানা ছিল না, উত্তরাধিকারে যে এতো জটিলতা আমি জানতুম না। নাম পাল্টানো, সাকশেসান সার্টিফিকেট, ইন্সুরেন্সের টাকা আদায়, ভাড়াটের ঝামেলা, ব্যাঙ্কের হিসেব, মামলা মোকর্দমা, ইনকামট্যাক্সের রিটার্ন, ওয়েলথ ট্যাক্স, মিউনিসিপ্যালিটির জট-জটিলতা ইত্যাদি ইত্যাদি হরেক দায়-দায়িত্বে আমার দিন-রাত্তির ভীষণ ছোট

হয়ে গেল । এ ছাড়া মার অসুস্থতার জন্যে মার নামের সবকিছু আরো জট পাকিয়ে গেল । ফলে সময় নেই, সময় নেই । বন্ধুরা বিরস মুখে ফিরে যাচ্ছে, আত্মীয়-স্বজনরা ঠিকমত আপ্যায়িত হচ্ছেন না, এমন কি আমার খাওয়া-দাওয়া অনিয়মিত হয়ে গেল । কোথায় ফূর্তিতে আকাশ রাঙাবো তা না, আমি একজন ঘুঘু বিষয়ী বলে পরিচিত হলুম । তদুপরি মার অসুস্থতা ‘আমারই বানানো কিছু’—এমন রটনায় দিক ঢাকল ।

আমি সরকার কাকার হাতে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে মুক্তি চাইলুম ।

সরকার কাকা রাজী হলেন না ।

o

মধ্যরাতে মনে হল কে যেন দরজায় আলতো ধাক্কা দিচ্ছে । কি হল হঠাৎ ? কে ধাক্কা দিচ্ছে ? আমি ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলতেই সেই বউটা, যাকে কিছুদিন আগে কাজে বহাল করেছি, আলুথালু বেশে ঘরে ঢুকল ।

তুমি ! কি ব্যাপার ?

ওই দেখুন । ও হাত তুলে মার ঘরের দিকে দেখাল । আমি চমকে মার ঘরের দিকে তাকালুম । অস্পষ্ট আলোয় দেখলুম, মা ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারী করছেন । মাঝে মাঝে জানালার কাছে ছুটে যাচ্ছেন, আবার হাঁটছেন, আবার যাচ্ছেন ।

সে কি ! ওষুধ দাওনি ?

সে জানালে, সে জানে না ।

বিমলির মা কোথায় ?

বুড়ির বড্ড জ্বর ।

সুবালা ?

ওর ছেলের অসুখ, ছুটি নিয়েছে ।

ও । আর কি জিজ্ঞেস করব ? আমি হাতড়ে হাতড়ে শুধলুম, তুমি

নতুন এসেছ, না ?

ও মাথা নাড়ল।

তোমার নাম ?

খুব আস্তে জবাব দিল, ময়না।

এতক্ষণে অন্ধকার প্রায় সয়ে গেছে। আমি ওর দিকে ভাল করে তাকালুম। বুকের কাপড় মেঝেয় লুটচ্ছে। আমি আরো ভাল করে ওর বুকের দিকে তাকালুম। ও আমার মুখে চোখ রাখতে গিয়ে পলকে বুকের কাপড় সামলে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি হাত বাড়াতে গিয়েও হাত গুটিয়ে নিলুম। ছিঃ!

o

আমি সম্ভ্রান্ত কিনা, আমাদের পরিবার সম্ভ্রান্ত কিনা আমি তখনো জানিনে, অথচ এক আশ্চর্য সম্ভ্রমবোধে আমি তখনো পর্যন্ত সদাচারী, সংযত। ফলে কদাচিৎ কারো বাড়ী যেতুম, গেলেও এক স্পর্শকাতর মর্যাদাবোধে আমি নির্লিপ্ত থাকতে চেষ্টা করতুম। আসলে এই মহকুমা শহরে বাবার সম্মান ও মর্যাদা আমাকে ছোট হতে বাধা দিত, যার জন্যে পরিচিত হলেও ঘনিষ্ঠ হতে পারতুম না। অর্থাৎ এক অপরিচিত ভয় তখনো পর্যন্ত আমাকে উচ্ছৃংখল হতে দেয় নি।

o

কিন্তু সেদিন ভোর হতেই বাড়ীর সমস্ত লোককে ডেকে পাঠালুম। একে একে সবাই সামনে এসে দাঁড়াল। যারা অসুস্থ ছিল তারাও। পলকে সবার মুখ দেখা হলে শুধলুম, গত রাতে মার দায়িত্ব কার উপরে ছিল ?

সেই বউটা এগিয়ে এল। মাথায় ঘোমটা। প্রায় নির্ভয়ে আমাকে দেখছিল। আমি অবাক হয়ে দেখছিলুম ওর আশ্চর্য ধারালো দৃষ্টি ও দোহারা চেহারা।

তুমি ওষুধ দাও নি কেন ?

আমাকে কেউ বলে দেয় নি।

আমি বিমলির মার দিকে তাকালুম।

মাথার যন্তরনায় ভুলে ছিলুম বাপু। বলতে ভুলেছি। আর হবে নি।

ঠিক আছে। আর যেন কখনো এমন ভুল না হয়। বউটার দিকে তাকিয়ে শুধলুম, তুমি লেখাপড়া জানো ?

সে মাথা নাড়লে।

এখন থেকে তুমিই মায়ের দায়িত্ব নিলে।

সে হাঁ না কিছুই না বলে তাকিয়ে রইলে।

আমি বললুম, কেউ দোষ করে 'ভুল হয়েছে, আর কখনো হবে নি'—এসব বলা আমি পছন্দ করি নে। আমি চাই যে, যার যা দায়িত্ব সে তা ঠিকভাবে পালন করবে। বউটার দিকে তাকিয়ে বললুম, ওষুধ বুঝতে যদি অসুবিধে হয় সরকার কাকাকে জিজ্ঞেস করো, নতুবা—খুব আস্তে বললুম, আমাকে।

শেষ কথাটা বউটা শুনেছে নিশ্চয়ই, নইলে ওর চোখ মুখ অমন উজ্জ্বল হয়ে উঠত না!

উজ্জ্বল হয়েছিল কি ? নাকি আমিই ভুল দেখেছি ? আবার মুখ তুলে তাকাতে গিয়ে দেখি, বউটা মাথা নীচু করে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে মেঝে ঘষছে।

আমি ওদের কাজে যেতে বলে নিজের ব্যস্ততায় ডুব দিলুম।

o

বাবার যে এতো পাওনাদার ছিল আমি জানতুম না। অথচ কাজকর্ম হাতে নেবার পর থেকে ওদের জ্বালায় প্রায় অতিষ্ঠ! ওদের হাব ভাব, কথাবার্তায় সারাক্ষণ দাবীর সুর ঝলসে উঠছে—এখানেই আমার রাগ।

আপনাদের হাব ভাব যেন বাবা আপনাদের কাছে ঋণ করেছিলেন।

না, না, তা কেন, উনি দিতেন। এবং আমরা জানি যে আমরা পাবই।

ওটা ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবে ধরেই আমরা বাজেট তৈরী করেছি। এখন—

যদি আমি না দিই—বলেই ওদের মুখে চোখ রাখতেই ওদের চোখ মুখ ফ্যাকাশে; রক্তশূন্য। এমন ভয় পাইয়ে দিতে আমার বেশ লাগে। বললুম, বাবার পক্ষে যা সম্ভব ছিল আমার পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

তাহলে ?

তাহলে সে আপনারা বুঝবেন।

কেউ কেউ এমনতর অবস্থায় ফাইল পত্তর বের করে ওদের অসুবিধের কথা বোঝানোর জন্যে উঠে পড়ে লাগতেন। আমি অধৈর্য হয়ে বলতুম, ওতে আমার মত পাল্টাবে না।

আজ্ঞে—

অনেকেই তখন আমাকে সেই সমস্ত পদমর্যাদা উপহার দিতে চাইতেন, যা বাবাকে দিয়েছিলেন।

ও! তাহলে আপনারা এভাবে কাজ গুছোন। বেশ! বেশ! কিন্তু আমি ওসব পছন্দ করিনে, পয়সা ফেলে মর্যাদা—

তাহলে যোগ্যতার স্বীকৃতি কোথায় ? তাহলে সবই কেনাকাটার ব্যাপার ? সবই কড়ির মূল্যে ?

হা ঈশ্বর! এই সমাজে প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির ব্যাপারে আমার আকৈশোর লালিত ধারণা বিষম ঝাঁকুনি খেল। আমি ক্ষুব্ধ হলুম, ক্ষুণ্ণ। ইচ্ছে হল, এ সমস্ত আপদদের খালি হাতে বিদায় করি, না, সে ঠিক হবে না। সরকার কাকাকে বললুম, ওঁদের বাবা যা দিতেন তাই-ই দিয়ে দিন, কিন্তু মনে রাখবেন, আমি ওসবের মধ্যে নেই। আমার নাম যেন কোথাও না থাকে।

ওঁরা অবাক, সরকার কাকাও।

তাহলে কার নামে বিল কাটবে ?

কেন ? মার নামে।

আমি অন্য কাজে মন দিলুম।

লোয়ার কোর্টে বাবার বিরুদ্ধে কিছু মামলা ঝুলছিল । বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে সে সব কেসের ইতি ঘটল । কেসগুলো কি ? কেসগুলো কেন ? আমি তার কিছুই জানতুম না । কানাঘুষোয় শুনেছিলুম, এ কেসগুলোতে বাবার সুনাম ও প্রতিষ্ঠা ধুলোয় লুটোবে । সরকার কাকাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, ওসব কিছু বদলোকের কারসাজি, শুধু হয়রানি করার জন্যে । শুধু শুধু তোমার বাবাকে একরাশ দুঃখ দিলেন ।

ওরা কারা ?

এ প্রশ্নে সরকার কাকা যেন চমকালেন । বললেন, দেখ বাপ, আমার বয়েস হয়েছে, আমি তোমার বাবার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলুম । তোমারও হিতৈষী । যদি আমার কথা মানো, তাহলে বলি, পুরনো কাসুন্দী ঘেঁটে লাভ নেই, গন্ধ ছাড়বে । তার চেয়ে—

সরকার কাকার এই অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে আমি গূঢ় রহস্যের গন্ধ পেলুম । মুখে বললুম, না, না, ওসব কিছু নয়, এমনি কৌতূহল হল জিজ্ঞেস করলুম, নইলে—

মনে মনে ভাবলুম, হয়ত এসব মামলার কাগজ-পত্তরে আমার প্রত্যাশিত কিছু খবর অবশ্যই পাব । তার ব্যবস্থা আমাকে গোপনেই নিতে হবে । কাকা বললেন, তোমার বয়সে পেছন ফেরা কোন কাজের কথা নয় ! এ বয়েসে তোমরা শুধু এগোবে । তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলি, ইদানীং তুমি খুব বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছ ।

কি ব্যাপারে ? আমি অবাক হয়ে সরকার কাকার দিকে তাকালুম ।

ওই যে ! ওই সব আশ্রম, ক্লাব, সমিতি ইত্যাদিতে তুমি যে নিজেকে আড়ালে রাখছো, এ বড় ভালো হচ্ছে ।

কেন বলুন তো ?

কাকাবাবু এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না । ভেবেছিলেন, ওঁর বলা কথা আমি শুধু শুনেই যাব, কোন প্রশ্ন করব না । ফলে প্রশ্ন করতেই

তিনি আসল জবাব এড়িয়ে আমাকে খুশি করার জন্যে বললেন, যদি কিছু মনে না করো, আমার মনে হয়েছে তুমি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী নও।

মানে ?

মানে লোভী নও। এই আর কি! খুব ভালো, খুব ভালো।

বার বার কাকাবাবু পিছলে যাচ্ছেন দেখে আমি প্রসঙ্গ পাল্টে বললুম, আমি এসব বিষয়-বিত্তের ঝামেলা থেকে ছুটি চাই। আপনি আমাকে ছুটি দিন।

উনি হাসলেন। বললেন, অতো ছুটি হাতে তুমি কি করবে ? আবার পড়বে ?

না।

তাহলে ?

আমি আমার ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াবো।

উনি ক্ষণকয় কি যেন ভাবলেন। বললেন, তুমি বড্ড বাঁধাবাঁধির মধ্যে বড় হয়ে উঠেছ। অত কড়াকড়ি আমার পছন্দ ছিল না। আমি তোমার বাবাকে বহুবার বলেছি, উনি গা করেন নি। উনি থামলেন।

শুধলেন, কদ্দিনের ছুটি চাও ?

যদ্দিন আমি ক্লান্ত না হই।

সে কি একটি কথা হল। তাছাড়া তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ যে, আমারও বয়স হয়েছে, আমি তোমার বাবার বয়সী। যে কোন দিন—

না, না, সে কি বলেছেন ?

উনি ও প্রসঙ্গে কথা বাড়ালেন না। বললেন, আরো মাস দুয়েক তোমাকে ভুগতে হবেই। সাকসেশানের ঝামেলা না মিটলে তোমার বেরোন চলবে না। তাছাড়া তোমার মা—উনি আমার দিকে চোখ তুলে চোখ নামিয়ে বললেন, এত অসুস্থ, এ অবস্থায়—

আমার মাথা নীচু হল। বললুম, ঠিক আছে, দু'মাস পরেই যাব।

সেই-ই ভালো। উনি চলে গেলেন।

০

বাইরের ঝামেলা, হিসেব পত্তরের খুঁটিনাটি, লোকজনের দেখা সাক্ষাৎ যখন বেলার মতো সারা তখন ক্লান্তিতে আমি অবশ। স্নান খাওয়া-দাওয়া কোনমতে সেরে ঢলে পড়তুম বিছানায়। বেলা ঢললে বিছানা ছাড়তুম।

ঐ দুপুর ঘুম আমার সর্বনাশ ডাকলে।

বিকেলে চা দিয়ে যেত ময়না। প্রথম প্রথম দূর থেকেই সব কাজ করত। বেশ তফাতে থেকে। ক্রমে সে দূরত্ব ঘুচছে। চোখে চোখ রাখছে, কখনো মুচকি হাসছেও। এমন কি এলোমেলো দুচারটে কথাও। একদিন ত চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়েই রইল।

ফল হল এই—

রাত্রে বিনিদ্র আমি উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতুম। কার জন্যে, কিসের জন্যে, ঈশ্বর জানেন, অপেক্ষা করতুম। এবং অপেক্ষা করতে করতে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়তুম।

এমন কি কয়েক রাত উৎকণ্ঠা ও প্রত্যাশায় পার হলে এক রাতে আমার মনে হল আমি একটা অস্বাভাবিক টান অনুভব করছি। মনে হচ্ছে আমি অসম্ভব কিছু করব, আমাকে করতে হবে, এবং—

আমি পা ফেলে ফেলে সারাবাড়ি ঘুরে এলুম। সেই নিশুতি রাতে কেউ যদি আমাকে দেখতো নিশ্চয়ই আমার এ অভিযানকে অভিসার ভাবতো। অভিসারই তো। ভয়ে গা পা কাঁপছে। বুকে যেন কে মুগুর হানছে। তবু আমি সতর্ক পা ফেলে হাঁটছি।

আমি ময়নাকে খুঁজছিলাম। পেয়ে গেলুম। মার ঘরের দক্ষিণের বারান্দার খুপরিতে ও ঘুমোচ্ছিল।

দরজা খোলা, আমি ঢুকতেই—

কে?

আমি পাথর। তবু আস্তে উচ্চারণ করলুম, আমি।

ও ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আপনি?

ও কি আমারই মতো জেগেছিল? বিনিদ্র ও উৎকর্ণ? ও কি প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা করছিল?

আমি এক পা এগোতেই ও উঠে দাঁড়াল। আমি থর থর করে কাঁপছি। আরো এগোব কি এগোব না, ও বললে, আপনি ঘরে যান। হয়ত মা জেগে আছেন। খুব আস্তে আস্তেই বলল, তারও গলা কাঁপছে।

আমি শুধলুম, তুমি?

আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। ওকে ধরতে হাত বাড়াতেই ও এক পা পিছিয়ে গেল। আপনি যান, আমি যাচ্ছি।

আঃ! আমি স্বস্তিতে শ্বাস ফেললুম। কাঁপুনি কমছে। বললুম, দেরী করবে না লক্ষ্মীটি।

শেষ শব্দটা নিজের কানেই কেমন যেন শোনালো।

পা বাড়াতে গিয়ে ভয়ে কুঁকড়ে গেলুম। মা জেগে আছেন কেন? ওঁকে কি ওষুধ—

ও প্রশ্ন করা হল না, পা বাড়ালুম। খুব সতর্ক, তবু যেন মনে হল কারা যেন আমাকে দেখে ফেললে। আমি পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকে বিছানায় ঢলে পড়লুম।

যাক্, বাঁচা গেল। এবং সে মুহূর্তে মন বললে, ও না আসুক। যদি জানাজানি হয়ে যায়! যদি! আবার মনে হল, কি হবে জানাজানি হলে? আমি-ই ত এখন এ বাড়ীর সব। তাহলে?

আমি দরজার দিকে তাকালুম। দরজা আধভেজানো আছে।

প্রতিটি মুহূর্ত ঘণ্টার পরিসর পাচ্ছে। আমায় অস্থিরতাও মুহূর্মুহু বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে—ও এখনো আসছে না কেন? আমি দরজা পর্যন্ত আলতো পায়ে এগিয়ে ফাঁকে চোখ রাখলুম। না, কোথাও কোন ছায়া শরীরের চিহ্নও নেই।

নিঝুম, নিস্তব্ধ বাড়ীটা যেন মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

তাহলে?

আমি যখন রাগে জ্বলছি, যখন ভাবছি ওই বদমাস মেয়েছেলেটার চুল ধরে টেনে নিয়ে এসে আমি দেখিয়ে দেব এ বাড়ীতে আমি কি পারি বা না পারি, ঠিক তখনই দরজায় মৃদু শব্দ হল। আমি মুখ তুললুম। সে এসেছে কি ? আমি চমকে দরজার দিকে তাকালুম, নাহ্ বাতাস। বাতাস আমাকে ছুঁয়ে গেল। তাহলে এল না ? হঠাৎ মার গলা শুনলুম। কে ? কে ওখানে ?

বারান্দার বাতি জ্বলে উঠল।

আমি ময়না।

ও তুই। কোথায় যাচ্ছিস্ ?

কলঘরে গিয়েছিলুম, ফিরছি।

আমি শ্বাস বন্ধ করে শুনলুম। দেখলুম, ময়না দ্রুত পায়ে তার ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে।

তাহলে ? ও কি !

আমি সীমাহীন ক্লান্তিতে বিছানায় ঢলে পড়লুম। ঘামছি, ভীষণভাবে ঘামছি।

o

কি হয়েছে তোমার ? সরকার কাকা আমার মুখে চোখ রেখে শুধলেন। চোখগুলো লাল, মুখ ফোলা, কি ব্যাপার ? জ্বর হয়েছে ?

আমি মাথা নাড়লুম।

তাহলে ?

ঘুম হয় নি।

সে কি ! ঘুম না হবার মতো ভাবনা তো তোমার উপর চাপাই নি বাবা।

না, তা নয়।

তাহলে ? সরকার কাকার কৌতূহলী চোখ আমাকে জরিপ করছিল। আমি মুখ নামিয়ে বললুম, জোরজার করে সেই মান্ধাতাই রাস্তাতেই

তো ঢুকে পড়লুম, আর কি বেরোতে পারব ?

সরকার কাকা হো হো করে হেসে উঠলেন । এই !—বাবার মৃত্যুর পরে এমন সশব্দ হাসি এই প্রথম । আমি বললুম, এ আমি চাইনি ।

আহা ! সরকার কাকা জিভে একটা শব্দ করলেন । কে-ই বা চায় ? তবু দায় না মেনে কি পার আছে ?

সে দায় মানতেই তো—

দেখো, ক্রমে ক্রমে ঠিকই সয়ে যাবে । তখন আর ভার মনে হবে না । তা ছাড়া—একটু হেসে বললেন, ছুটিও পাবে, তবে আরো দিন কয় পরে ।

কদ্দিন ? আমি মুখ তুললুম ।

ধরো, দিন দশেক ।

ও । আমি কাজে মন দিতে চাইলুম, পারলুম না । মন ভীষণ অস্থির । উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, একটু ঘুরে আসি । ভাল লাগছে না ।

বেশ ।

আমি পায়ে পায়ে অফিস ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে ঘরে ঢুকলুম । আয়নায় দেখলুম, জামাকাপড় ঠিকই আছে । সেফ খুলে যা হাতের কাছে পেলুম তুলে নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রাখলুম । বেরোতে যাব, ময়না ঘরে ঢুকল ।

কি চাই ? আমি চেঁচিয়ে উঠলুম ।

ও একটুও অবাক হল না । সহজভাবে বলল, আপনার মার দায়িত্ব আমি আর নিতে পারব না ।

মানে ?

উনি আমার হাতে কোন ওষুধ খান না ।

আমি রেগে জিজ্ঞেস করলুম, নিজের হাতেও কি খান ?

সে ত আপনাকে দেখিয়েছি ।

তা বটে । তাহলে তুমি কি করবে ?

যদি বলেন, রান্নার কাজ—

ঠিক আছে । কিন্তু মার দেখাশোনা ?

আজ থেকে সরলা করবে।

সরলা? সেই পুঁচকে মেয়েটা?

পুঁচকে কোথায়? সহজ গলায় বললে, ও চোদ্দয় পড়েছে।

একথা বলার জন্যে তুমি এ ঘরে ঢুকেছ?

সে আমার রাগ দেখে চোখ তুলল। ঠোঁটে আবছা হাসি, চোখে মৃদু উচ্ছ্বলতা। চোখ নামিয়ে বলল, অতো রাগার মতো কিছু ঘটে নি। ও আমার থেকে ভাল, তাছাড়া ওর অভ্যেস আছে।

কি?

ও আমার কথা না শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আশ্চর্য সাহস তো!

ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে টেনে দু'চার লাথি কষিয়ে দিই পাছায়। হাড়গোড় গুঁড়ো করে ফেলি। নাহ্।

ঘর থেকে বেরোতেই দেখি মা জানালার গরাদে মুখ চেপে আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখে একলক্ষ ঘৃণা!

আমি লজ্জায় মুখ নামাতে গিয়েও না নামিয়ে মাকে শুধলুম, তুমি ওই মেয়েটার হাতে ওষুধ খাচ্ছ না নাকি?

মা কোন জবাব না দিয়ে চোখে ঘৃণা ছিটোতে ছিটোতে সরে গেলেন। রাগে আমার গা জ্বলছে। ভেবেছে কি? আমি চেঁচিয়ে বললুম, আজ থেকে সরলা তোমাকে দেখবে।

আমি তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে সদর ডিঙিয়ে রাস্তায় পড়লুম।

○

মেল ট্রেনটা যখন স্টেশানে এসে ঢুকল তখন আমি ওভারব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে। ট্রেনটা গড়িয়ে যাচ্ছে, গড়িয়ে যাচ্ছে—যেতে যেতে একসময় থামল। তারপরেই কোলাহল।

আমি জটপাকানো রেললাইনে চোখ পেতে মনোমত একটি লাইন ধরে অনেকক্ষণ ছুটতে ছুটতে আমার দৃষ্টি যখন আচ্ছন্নতায় অনেক দূরে

হারিয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছেই, হঠাৎ রেলের বাঁশি আকাশ মাটি আমার বুক কাঁপিয়ে বেজে উঠল। আমি চমকে মন ফেরালুম। তেমনই কোলাহল প্লাটফর্ম জুড়ে। আবার বাঁশি বেজে উঠতেই আমি পড়িমরি সিঁড়ি ভেঙে ট্রেনের ছুটে চলা হাতল ধরে আচমকা ঝুলে পড়লুম। এক মোচড়ে কামরার ভেতরে। ট্রেন ছুটছে।

কোথায় যাচ্ছ ?

কে শুধলো ?

তোমার টিকেট ?

বুঝ পকেটে হাত দিতেই টাকার অভয় স্পর্শ পেলুম।

ঠিক আছে।

০

এক ফাঁকে একটা জায়গা পেয়ে গুছিয়ে বসতেই পাশ থেকে কে যেন বললে, তুই !

সে কী ? তুই !

অনেকদিন পরে দেখা অমলের সঙ্গে। শুধলুম, কোথায় আছিস্ ?

সে গড়গড় করে ওর ঠিকানা বললে।

কি করছিস্ ?

হেসে বললে, দালালী।

সে কি রে ! কিসের ?

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর যাহা অনায়াসে ক্রয় ও বিক্রয় যোগ্য।

ওর শুদ্ধভাষার উত্তরে আমি মজা পেলুম, অন্যান্যরাও। অমল আমার স্কুলের সহপাটী। বছর চারেক পরে দেখা। সে শুধল, তুই কোথায় ?

আপাততঃ তোর সঙ্গে।

সে কি রে ?

কেন নয় ? আমি কি কেনা-বেচা করতে পারিনে ?

ও মজা পেল। বললে, ঠিক আছে। কিন্তু ফিরবি কখন ?

তুই কখন ফিরবি ?

আমি ! ফিরলেই হল, না ফিরলেও কি। আমার কোন ঠিক নেই।

আমারও।

ও খুশিতে আমার হাত ওর হাতে তুলে নিল। তোরা বড় মানুষ।

তোকেও খুব ছোট মনে হচ্ছে না।

ও হাসল।

শহরে যখন পেঁছিলুম তখন বেলা ভাঙছে।

অন্ধকার গাঢ় হবার আগেই রাস্তার আলো জ্বলে উঠল।

অমল বললে, অনেক হাঁটা হল, চল রিক্সা নিই। এভাবে সমানে সমানে হেঁটে মানুষ দেখা যায় না।

হেসে বললুম, উচুঁতে উঠলেও তো সেই মানুষ-ই।

না, ঠিক তা নয়, অমল বললে, কিছুটা ছোট।

ওর কথা আমাকে চমকে দিল।

মহানগরী ক্রমে অভিসারিকা হয়ে উঠছে।

বললুম, কতদিন পরে এসেছি, বেশ লাগছে।

আরো লাগবে। আগে চল।

কোথায় ?

আমার কৌতূহল দেখে সে হাসলে। বললে, চ'না।

রিক্সা অমলের নির্দেশ মতো এ রাস্তা ও রাস্তা মাড়িয়ে একটি গলির ভেতরে ঢুকে দাঁড়াল। আমরা নামলুম। ভাড়া মিটিয়ে দিতেই সে আমার হাত ধরে টানলে। আমরা পা বাড়াতে যাব, দুটো হিন্দুস্থানী ছুটে এসে কোথায় যাব জিজ্ঞেস করার মুহূর্তে অমল খেঁকিয়ে উঠল, দরকার নেই। তোমরা যেতে পার।

ওরা কারা ?

অমল বললে, রাস্তার লোক।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে কাদের যেন হাসি শুনে মুখ

তুলতেই অমল ওদের পাশ কাটিয়ে আমাকে টানতে টানতে সব শেষের একটি ঘরে এসে ঢুকল !

বাঁচলুম ।

o

কোনায় বসানো ড্রেসিং টেবলের সামনে থেকে মেয়েটা হাসতে হাসতে উঠে এল । খোলা চুল । মুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই । মুখে চোখে সর্বাঙ্গে এক পরিচ্ছন্ন শ্রী, বড়ো স্নিগ্ধ, চোখজুড়োন । বলল, অমলবাবু যে !

শুধনোর ঢঙ বড়ো মিষ্টি ।

আমার বন্ধুকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে এলুম ।

মেয়েটা হাত তুলে নমস্কার করলে । বসুন, এই আসছি । বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল !

এতক্ষণে ঘর, ঘরের দেয়ালগুলো চোখে পড়ল । এখানে ওখানে দু'একটা ফটো, কোথাও একা, কোথাও আর কারো সঙ্গে । বড়ো একটি ক্যালেণ্ডারে একটি চিত্রাভিনেত্রীর ফটো । একটি চাইনিজ কেবিনেটে কিছু পুতুল, কিছু পাথুরে মূর্তি, একটি শ্বেত পাথরের তাজমহল । কিছু গ্লাস, প্লেট । পাশে দাঁড় করানো একটি তানপুরা । ট্রাঙ্কের উপরে বাঁয়া তবলা । তার পাশে আলনায় গুছনো কিছু জামা-কাপড় । চোখ ঘুরছে । পাশে একটি খুপরি ঘর । সেখানে বাসন-পত্র, স্টোভ, একটি বালতি, মগ, একটি গামছা । আমি বিছানায় হাত রাখলুম । গদীটা মেঝেয় পাতা, বেশ পুরু । বড় বড় দুটো তাকিয়া । কোনায় একটি পিকদানি ।

পা তুলে বস ।

আমি পা তুলে বসলুম ।

স্পষ্ট বুঝলুম, আমি—

কত নেয় রে ? আমি শুধোলুম ।

তেমন বেশী না।

তবু কতো ?

সারারাত থাকবি ?

যদি থাকি।

শ' খানেক।

আমি স্বস্তি পেলুম। তেমন বেশী নয়।

কি, খারাপ লাগছে ?

মেয়েটা ঘরে ঢুকল। একটা সুগন্ধও।

আপনি বুঝি এই প্রথম এলেন ? একটু তফাতে বসতে বসতে মেয়েটা শুধল।

আমি মেয়েটাকে দেখছিলুম। জবাব দিলুম না।

অতো কি দেখছেন ?

বলতে হয় বলে আস্তে বললুম, আপনাকে।

কেন খারাপ দেখতে ?

তা কেন ? আমি অপ্রস্তুত।

কিছু খাবেন ?

আমি অমলের মুখের দিকে তাকালুম। অমল বললে, বিয়ার আনাও।

মেয়েটা উঠে গেল।

অমল শুধলো, পছন্দ হয়েছে ?

আমি হাসলুম।

তাহলে তুই কণার সঙ্গে থাকবি, আমি রুমির ঘরে যাব। একটু থেমে বললে, রুমিকে দেখবি ?

মন্দ কি।

ও ঘর থেকে বারান্দায় গিয়ে বলল, মাসি, রুমিকে একবার এদিকে আসতে বল তো !

কিছুক্ষণ পরে অমল রুমিকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। প্রসাধন বড়ো উগ্র। কিন্তু আশ্চর্য শরীর ! মোচড় দিয়ে দিয়ে যেন উপরের দিকে উঠে

গেছে।

মেয়েটা হাত তুলে নমস্কার করলে।

বসব ?

আমি আবার অপ্রস্তুত। বললুম, নিশ্চয়ই বসবেন।

তারপরে একরাশ কথা, বিয়ার, খাওয়া-দাওয়া, অনেক হাসাহাসি, এবং অমলের দেখা-দেখি কিছু খুনসুড়ি।

একসময়ে রুমিকে নিয়ে অমল চলে যেতেই কণা দরজা দিতে গিয়ে শুধলো, সারারাত থাকবেন ?

আমি মাথা নাড়লুম।

তাহলে, ও কি যেন ভাবলে। বললে, যদি কিছু মনে না করেন, টাকাটা।

কতো ?

অমল বাবুর খরচাও আপনি দেবেন ত ?

আমি ঘাড় নাড়লুম।

আমার একশ', রুমির সত্তর।

আমি দুটো একশ' টাকার নোট এগিয়ে দিলুম।

কণা শুধলো, তাহলে খাবার আনতে বলি।

আনো।

কণা কাকে ডেকে কিসব বলে দরজা দিল।

০

সবে ন'টা। একটি পুরোরাত্তির সম্মুখে। বিয়ারের ঝাঁজ ঢেঁকুর হয়ে উঠছিল। কান গরম, মাথা ঝিম ঝিম করছে। কণার বাধা সত্ত্বেও আরো বিয়ার খেলুম, খাবারও।

কেমন অস্বস্তি।

একসময়ে কণার হাতে হাত রেখে ওকে বুকে টেনে আনলুম। এবং জড়িয়ে ধরে বিছানায় গড়িয়ে পড়তে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ-ই বুক ঠেলে কি

যেন বেরিয়ে সব ভরিয়ে দিলে। কণা ছিটকে সরে গেল। আমি আর কিছু জানিনে। শুধু কিছু শব্দ, কিছু কোলাহল, আরো কি কি যেন !

০

ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়েছে। চোখমেলে দেখি ঘরে কেউ নেই। আমার পরণে একটি শাড়ি। মাথা এতো ভারি যে তুলতে পারছি নে।

আমি আবার চোখ বুজলুম। শিরাগুলো দপ্ দপ্ করছে। মাথা ছিঁড়ে যাবে যেন ! শিরা চেপে ধরে উঠতে যেতেই কণা ঘরে ঢুকল হাতে একগ্লাস জল ও স্যারিডন।

নিন, খেয়ে ফেলুন।

আমি গিলে ফেললুম।

অমল কোথায় ?

আসছেন।

এবার আমি যাব।

কণা কোন কথা না বলে আমার জামা কাপড় এনে দিল। বললে, দেখুন সব ঠিক আছে কি না। হেসে বললে, বড্ড ছেলেমানুষ। অতো টাকা নিয়ে কেউ এখানে আসে ?

আমার মাথা নীচু থেকে নীচু হয়ে যাচ্ছে।

লজ্জার কি ! প্রথম প্রথম অমনি হয়। কিছু মনে করিনি। আমি চোখ তুললুম।

মনে করলে কি আমাদের চলে ?

কৃতজ্ঞতা নিশ্চয়ই আমার চোখে-মুখে।

ও শুধলো, এখন কেমন লাগছে ?

ভাল।

অস্বস্তি লাগলে আরেকটা স্যারিডন খাবেন। এই নিন, সঙ্গে রাখুন।

আমি হাত বাড়িয়ে নিলুম।

শুধু শুধু অতগুলো টাকা—

ও থাক। অমল, অমল কৈ?

অমল ঘরে ঢুকল।

আমি বললুম, চল।

অমল কথা বাড়াল না। কনা কি যেন কি বলতে চেয়েছিল, না বলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

আমরা পায়ে পায়ে রাস্তায়।

ট্যাক্সি-ই—

অমল আমাকে তুলে দিয়ে নিজে উঠে বসল।

০

হোটেলে এসে ঘরে ঢুকতেই অমল বললে, গতরাতে তুই—

আমি বিরক্তিতে ভ্রূকুঁচকে বললুম, ও থাক। তোকে কতো দিতে হবে?

কি? কি বললি?

যেন আকাশ থেকে পড়লি মনে হচ্ছে! কেন, তখন বললি না, তোর পেশা দালালী।

ফোঁস করে উঠতে গিয়ে অমল ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ল। তুই এই?

সে কি! তোর ক্ষতি হোক এ তো আমি চাইতে পারিনে।

অপলক অমল আমার দিকে তাকিয়ে রইলে। যেন অচেনা কেউ। বললে, তুই খুব খুশ হয়েছিস্, না?

আমার হঠাৎ হাসি পেল। কিছু বলতে যাব, অমল হঠাৎ উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল। আমি জামা খুলে চেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দার দিকের দরজা খুলে দিলুম।

শহর ঘড়ঘড় করে চলছে।

ডাকতে ডাকতে একটা কাক উড়ে গেল গীর্জার দিকে ।
শহরে কাকের ডাক তেমন কানে লাগে না ।

বিকেলের ট্রেনে বাড়ি ফিরে এলুম । যখন বাড়ি ঢুকলুম, তখন রাত ।

o

বাড়ী ঢুকতেই কি একটা উচ্ছ্বাস চড়ে স্তব্ধ হল । এখন কোন শব্দ নেই ।

মুখ হাত ধুয়ে খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলুম । খাবার দিয়ে গেল ময়না । পরিপাটি গুছনো । ব্যবস্থা সবই নিখুঁত । কি যেন ভাবছিলুম তাই প্রথমে ঠিক খেয়াল করিনি । যখন খেয়াল হল তখন সে দরজার বাইরে । চোখ তুলেও কাউকে দেখতে পেলুম না ।

আমার অভ্যেস মতো খাওয়া দ্রুত সারলুম । একবার যেন আড়াল থেকে শুধিয়েছে, আর কিছু চাই কিনা, আমি কোন জবাব দিইনি ।

মুখ ধুয়ে বেরোবার সময় মনে হল, ময়না অন্ধকারে নিজেকে ঢেকে নিল ।

আমি সোজা আমার ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলুম । ঘুম দরকার । বড় বিশ্রীভাবে গত দিনরাত্তির কাটল । পাগলামী !

বাতি নিবিয়ে দিলুম ।

o

কি যেন ভাবছিলুম । কিছুতেই ঘুম আসছিল না । এপাশ-ওপাশ-এপাশ । কার যেন পায়ের শব্দ না ? আমি উৎকর্ণ হলুম এবং হঠাৎ বেডসুইচ টিপে বাতি জ্বালতেই দেখি ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে ময়না ।

তুমি ?

ও যেন একটু অপ্রস্তুত । তবু প্রায় সহজ গলায় বললে, জিজ্ঞেস করতে এসেছিলুম আমি রান্না করব কিনা ?

শুধু একথা জিজ্ঞেস করতে এই অন্ধকারে—আমি ওর দিকে তাকালুম। গা কাঁপছে রাগে ও উত্তেজনায়। শুধলুম, সত্যি করে বলো কেন এসেছ ?

ও সত্যিই থতমত খেল। জড়ানো গলায় বললে, ওই ত বললুম। যদি আপনার অপছন্দ হয়, তাহলে—

তোমার কে আছে ?

সবাই।

তবু একাজ করছো যে ?

গলার জোর দিয়ে বললে, বুঝতেই পারছেন, সখ করে নয়।

অনেক আগেই উঠে বসেছিলুম। উঠে দাঁড়ালুম। সে দরজার দিকে দু-পা পেছলো।

সেদিন এলে না যে ?

এসেছিলুম তো !

এসেছিলে ?

বাহ্, শুনলেন না মা জিজ্ঞেস করলেন। ও হাসল।

তাহলে আমি রান্না করব ?

আমি কি জবাব দেব ভাবতে ভাবতে সুইচ টিপে দিলুম। অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়তেই ও বললে, তাহলে যাচ্ছি।

ময়না—

আমি এগিয়ে যাবার আগেই সে বারান্দায়। আমি পড়িমরি ছুটে যাব -- মার ঘরের নীল বাতির আলোয় দেখলুম ও দ্রুত পায়ে মার ঘরের পাশ দিয়ে—

তাহলে এখনো ওই ঘরে।

আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। শরীর ফুটছে টগবগিয়ে। আমি অন্ধকারে থর থর করে কাঁপছি।

০

কি থেকে কি হয়ে গেল। মধ্যরাত্রে বাড়ী তোলপাড়। হতভম্ব আমি বিমলার মা, সরলাদের ঠেলে পড়িমরি ছুটে ছাদে উঠে গেলুম। কী লজ্জা !

বাবার পাঠাগার থেকে পরদিন যখন দৃঢ় পদক্ষেপে নামলুম তখন বেলা হেলেছে। নীচে কৈ কেউ তো আমাকে দেখছে না। মাও নয়। কোথাও কোন শব্দ নেই, সব স্তব্ধ। হল কি ?

আমি স্নান সেরে যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে খাওয়া-দাওয়া করলুম। না, ময়না নেই। কারো দিকে না তাকিয়ে পায়ে পায়ে বারান্দায়। মার ঘরের দিকে আলতো তাকালুম। না, মা দাঁড়িয়ে নেই। বাঁচা গেল। ঘরে ঢুকেই দেখি সরকার কাকা। সাপ দেখলেও অত চমকাতুম না।

শুধলুম, আপনি ?

উনি আমার দিকে বিষণ্ণ মুখ তুলে তাকালেন।

লজ্জায় আমার মাথা নীচু হয়ে গেল।

বললুম, কিছু বলবেন ?

হ্যাঁ, বলছিলাম কি, তুমি কিছুদিন বাইরে ঘুরে এসো।

আমি মুখ তুললুম। চোখাচোখি হল। উনি মুখ নামিয়ে বললেন, তুমি ছুটি চেয়েছিলে, না ?

আমি ঘাড় নাড়লুম।

তিনি বললেন, তাহলে আজই।

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে শুধলুম, আজই ?

হ্যাঁ, এক্ষুণি। তুমি একটি ফাঁদে পা দিয়েছ।

আমি বিস্মিত। বিমূঢ়। কি হয়েছে ?

সে কথা পরে হবে। এখুনি তুমি তৈরী হও। আমি গাড়ী বের করতে বলছি। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ালেন। দূরের কোনো স্টেশনে পৌঁছে গাড়ী ছেড়ে দিও।

আমি—আমার কথা না শুনেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

০

নিশির ডাকে যারা ঘর ছাড়ে, অর্থাৎ যাদের নিশিতে পায়, শুনেছি তারা এক বিমূঢ়তার মধ্যে নিশির ডাক অনুসরণ করে ছুটে যায়,—নিজেরা জানে না কেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, অথচ যায়ই, যেতে হয়ই। আমিও তেমনতর এক বিমূঢ় আচ্ছন্নতার মধ্যে তৈরী হয়ে নিলুম। নীচে গাড়ী পার্ক করার শব্দ। দু-চারটে কাপড় জামা তড়িঘড়ি গুছিয়ে সেফ খুলে টাকা যা হাতের নাগালে পেলুম নিয়ে পা বাড়াতে যাবো, মনে হলো, মাকে কি জানিয়ে যাওয়া উচিত? মা—হঠাৎ অবশ করা লজ্জা আমার দেহমন জুড়ে বসল। আমি কি করে মার সুমুখে দাঁড়াব? মা আমাকে কি ভাববেন? যদি শুধোন, তুই—তুই-ই—

মার ঘরের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও আমার সাহস হল না। আমার মনে হল, সারা বাড়ী যেন সহস্র চক্ষু দিয়ে আমাকে দেখছে। মনে হচ্ছে, মৌন এক ছি-ছিক্কারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন।

আমার মাথা ক্রমে নীচু হচ্ছে। নিজেকে মনে হচ্ছে কদর্য, ঘৃণ্য। আমি এতো নীচে নেমে গেছি? হা ঈশ্বর! কি করে এমন কাজ আমার পক্ষে সম্ভব হল? কে আমাকে এমন করে টেনে নামাল? কি করে আমি দু দুবার—

নীচে গাড়ীর হর্ণের শব্দ। কে যেন পায়ে পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠছে না? আমি এ্যাটাচী হাতে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সিঁড়ির মুখে সরকার কাকা।

টাকা নিয়েছো?

ঘাড় নাড়লুম।

যেখানে থাকো, ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দিও।

ঠিক আছে। আমি ঝুঁকে তাঁর পা ছুঁলুম। খুব আস্তে বললুম, মাকে দেখবেন। আর—ক্ষোভে দুঃখে আমার গলা বুজে এল। আমি পড়িমরি সিঁড়ি ভেঙে গাড়ীতে উঠে বসলুম। গাড়ী ছাড়ল।

আমার সম্ভ্রান্ত পিতার বিষয়-আশয়, স্মৃতি ও স্বপ্ন, প্রতিষ্ঠা ও প্রতি-

পত্তিকে ধুলোয় ধুলোয় আচ্ছন্ন করে গাড়ী ছুটেছে।
কাছের স্টেশান কন্দুর ?

○

আমার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে ময়না। সাক্ষী বিমলীর মা, সরলা, আরো কে কে। করিয়েছে বাবার বিরুদ্ধে যারা মামলা করেছিল তারাই। অর্থাৎ সুদর্শন রায় ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

সুদর্শন রায়েদের রাগ কোথায়, কেন, আমি জানিনে। সরকার কাকা আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেন নি। ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। তবে সরকার কাকা থানার মুখ চাপা দিয়েছেন, ওয়ারেন্ট আপাততঃ কার্যকরী হচ্ছে না। কিন্তু আমি ফেরারী॥

।। আদিপর্ব সমাপ্ত ।।

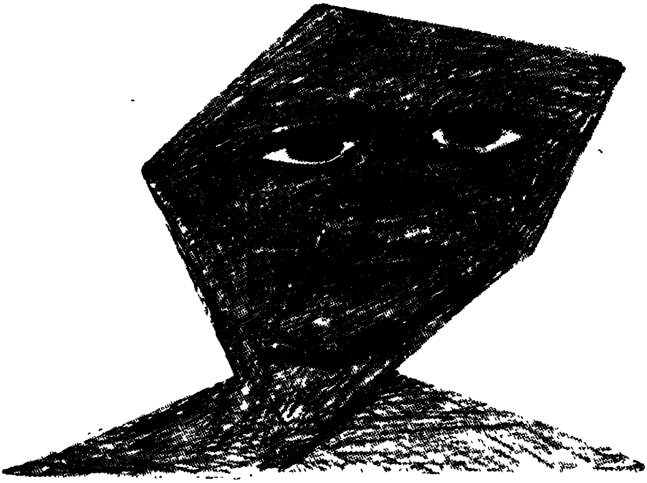

নতজানু • অন্ত্যপর্ব

৩

ন্যায়াধীশ ! আমার নাতিদীর্ঘ ফেরারী জীবনের পরমায়ু ফুরিয়ে এল । আমি দ্রুত আপনার দিকে যাচ্ছি ।

বহুদিন আমি আপনাকে এড়াতে চেয়ে ইতঃস্ততঃ ছুটে বেড়িয়েছি, একটি অনিবার্যের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ক্রমান্বয় অনিবার্যে মগ্ন থেকেছি ; একটি মিথ্যে ঢাকতে সহস্র মিথ্যেয় অবলীলায় নিজেকে জড়িয়েছি,—শুধু ভোলার জন্যে যে, আপনার অমোঘ পরোয়ানা নিরন্তর আমার ঠিকানা খুঁজে ফিরছে ।

ধর্মাবতার ! আমার ধারণা ছিল, পালিয়ে বাঁচা যায় ; নইলে, মানুষ পালাতে যায় কেন ? কেন সে পালানোর দুঃসাহস দেখায় ? সেই অন্ধ বিশ্বাসে আমি যতদূর সম্ভব আপনার তফাতে থাকতে চেয়েছি । ভেবেছি, দীর্ঘদিনের দূরত্ব সবকিছুকে একদিন অবশ্যই চাপা দিয়ে দেবে । আপনি সতাই ভুলে যাবেন, যেমন আমি আমার শৈশবকে ভুলেছি,—সেই নিষ্পাপ আমার আমাকে ।

অথচ আশ্চর্য ! আমি বার বার ভুলে যাই, আপনি আমি নন । আপনি কিছুই ভোলেন না । এবং এও জানি, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের যাবতীয় নথিপত্র আপনার সম্মুখেই রয়েছে । নইলে আপনার শান্ত, সৌম্য, করুণাঘন মুখ, আপনার গভীর অথচ মমতাসিক্ত দৃষ্টি, আপনার চাপা ওষ্ঠপ্রান্তের অস্ফুট হাসির অভয় আমি আমার অপবিত্র হৃদয়ের মধ্যে এমন স্পষ্টতঃ অনুভব করব কেন ? কেন মনে হবে, আপনি অনুক্ষণ আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখেছেন ?

ধর্মাবতার ! আপনাকে অদ্যাবধি চর্মচক্ষে চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য আমার হয়নি । তবু মনে হয়, আপনি আমার বড়ো চেনা, বড়ো বেশী পরিচিত । মনে হয়, আমি যেন আপনাকে বহুবার দেখেছি । সে কোথায় ? আমি সঠিক জানিনে । হয়ত আমার শরীরে, রক্তে, হৃদয়ে । হয়ত !

আচ্ছা, আপনি কি সন্ত বুদ্ধের মতো করুণাময়, ব্যথাতুর ? মহাত্মা যীশুর মতো সহৃদয়, ক্ষমাশীল ?

আমি সঠিক জানিনে। তবু ভাবতে ভালো লাগে, ওঁদের ওই অনিন্দ্য মুখের মতোই আপনার মুখ, ওঁদের মতোই সর্বজীবের জাগতিক দুঃখে অশ্রুসজল আপনার দুই চোখ, এবং আপনার অমল হৃদয় নিশ্চয়ই জীবাত্মার নিরবচ্ছিন্ন আর্তনাদ শুনে মমতায়, করুণায় বিগলিত।

ধর্মাবতার ! আপনি হয়ত তাই-ই, হয়ত তা নয়। তবু আমি আসছি, ছুটতে ছুটতে আসছি। বিশ্বাস করুন, আরো দেরী করার আর কোন উপায় আমার অবশিষ্ট নেই, ছিল না। ক্রমান্বয় পেছোতে পেছোতে, পালাতে পালাতে যেখানে পৌঁছিলুম সেখানেই, সে অন্তিমে, সেই বিকট হাঁ করা বিশাল অন্ধকারাচ্ছন্ন খাদ।

হুজুর, সেই অন্তিমে হয় অনিবার্য মৃত্যু, নতুবা আপনার অমোঘ দণ্ড।

যদি জিজ্ঞেস করেন, আমার প্রার্থনা কি ?

সানন্দে বলছি, আমার সবিনয় প্রার্থনা, আপনার সত্যতঃ, ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ উচ্চারিত শাস্তি। নিশ্চয়ই সে দণ্ড মৃত্যুর চেয়ে লঘু, সমূহ বিনাশের চাইতে সহজ।

অতএব, সর্বমান্য ন্যায়াধীশ ! আপনি সত্যের আসনে, ন্যায়ের আসনে, ধর্মের আসনে স্থির থাকুন, আমি বাঁচার বিনিময়ে কৃত অপরাধের সমস্ত মূল্য ধরে দিতে প্রস্তুত।

আপনি হাসছেন, হাসুন। আমি কিন্তু জীবনের বিনিময়ে কোন সন্ধি করতে রাজী নই।

o

আপনাকে আমি যা কল্পনা করেছি আপনি নিশ্চয়ই তা নন। নিশ্চয়ই তারো বেশি। সত্যি বলতে কি, কল্পনায় আমি আপনাকে ধারণাই

করতে পারিনি। কি করে পারব ? আমি যে আচ্ছন্ন।

কেন আচ্ছন্ন, কিসে আচ্ছন্ন, হুজুর, সেকথা ক্রমে বলছি ; তার আগে আমার বিনীত নিবেদন, আমি নিদারুণ তৃষ্ণার্ত।

ন্যায়াধীশ ! আমি জানি, এমনিতেই বড়ো দেরী হয়ে গেছে। আমি জানি, আরো আগে আমার আপনার শরণাপন্ন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মহানুভব ! আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, সব ঔচিত্য মানুষ মানেনি, মানুষ মানে না। এ ত্রুটি তার স্বভাবের। সে থাক। আমাকে এক গ্লাস জল দেবার অনুমতি দিন এবং বিশ্বাস করুন, আমি আপন পায়ের উপর আর দাঁড়াতে পারছি নে, অথচ বসার ব্যবস্থা এ কাঠগড়ার কোথাও নেই। প্রাণ যায় যাক, তবু আমাকে করজোড়ে আপনার সব প্রশ্নের সত্য উত্তর দিতেই হবে। ধর্মাবতার ! আমি রাজী। তার আগে দয়া করে অনুমতি দিন, কাঠগড়ার হাতলে আমার দুই হাত রেখে অনেক দূর থেকে পড়িমরি ছুটে আসার আতঙ্ক ও উত্তেজনা থামাই।

অনুমতি দিলেন ! আপনি সত্যই সহৃদয়।

দেখুন, কত স্বল্প আমার প্রার্থনা, অথচ আপনি তাকে তুচ্ছ বলে অগ্রাহ্য করেননি, মেনে নিয়েছেন। ধর্মাবতার, এ সত্যই মানবিক।

আমি ধরে নিচ্ছি, আমার মতো হতভাগ্যের প্রতি আন্তরিক করুণাবশতঃ আপনি এ অনুমতি দিয়েছেন, নাকি মানুষ হিসেবে ওটুকু আমার ন্যায্য প্রাপ্য ?

হুজুর, আমি জানিনে।

তবু ধরে নিচ্ছি, অন্য কোন কৌতূহলে আপনি এ দয়াটুকু দেখাননি। দেখিয়েছেন, একজন মন্দভাগ্য পরিশ্রান্ত মানুষের স্থিত হবার, শান্ত হবার, তার ক্লান্তি লাঘবের নিশ্চিত প্রয়োজনে। বিশ্বাস করুন, মানুষ মানুষের কাছে এটুকু সহানুভূতিরই কাঙাল। অথচ আশ্চর্য ! অনেকেই ওটুকু সহানুভূতি দেখিয়েও বাধিত করতে রাজী নয়। এই সমাজে প্রায় সবাই নিজেকে নিয়ে মগ্ন, মত্ত। নিজেকে ছাড়া অন্য

কাউকে দেখতে এখন আমরা রাজী নই। হুজুর—

না, না, ব্যতিক্রম আছে, অবশ্যই আছে। ধর্মাবতার! তাঁরা ক'জন?

হুজুর, দীর্ঘদিনের অভ্যাসে আপনি অনেক শুনতে অভ্যস্থ। আসলে আমার সব কথা শোনানোর জন্যে এমন মরীয়া ছুটে আসা। আপনি শুনেছেন এই অসীম ধৈর্যেরও অন্য নাম দয়া, এবং এও মানবিক।

o

ধর্মাবতার! তাহলে আমি সেদিন থেকেই সুরু করছি, যেদিন থেকে আপনার অমোঘ পরোয়ানা আমাকে তাড়া করে ফিরছে।

না হুজুর, ঠিক হল না। যে জন্যে আমার বিরুদ্ধে আপনার পরোয়ানা. সেই ঘটনা তার আগেই ঘটেছে। সুতরাং আমাকে আরো পিছিয়ে সুরু করতে হবে। সেই গোড়া থেকে।

o

ধর্মাবতার! মানুষ বড়ো দূর থেকে আসছে। পুরাণ বলে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রয়োজনে নিজেই স্বায়ম্ভুব মনু রূপে সৃষ্ট হলেন এবং আপন শরীরের অংশ থেকে শতরূপা নামে এক নারী সৃষ্টি করলেন। কন্যা শতরূপার সঙ্গে ব্যভিচারের ফলে যে সন্তানের জন্ম হল তারাই মানব।

ন্যায়াধীশ! 'প্রয়োজন' কথাটি আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এবং 'ব্যভিচার'।

হুজুর, এমনি এক 'প্রয়োজন' ও 'ব্যভিচারে'র সন্তান আমার পিতা।

আপনার ওষ্ঠাগ্রয়ী স্মিত হাসি কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, এ কাহিনী আমার স্বকপোলকল্পিত, শুধু প্রসঙ্গকে যুক্তিসহ করার জন্যে আমার উত্থাপনা।

না ধর্মাবতার! আপনার অনুমান ঠিক নয়। আমি এই পৌরাণিক

তথ্য সংগ্রহ করেছি আমারই মন্দ ভাগ্য পিতার দিনপঞ্জী থেকে।

০

ধর্মাবতার! আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, মানুষ তার যা যথার্থ প্রাপ্য প্রায়শঃ তার বেশীই সে দাবী করে, প্রার্থনা করে। সে তার যোগ্যতাকে ডিঙিয়েও হাত বাড়ায়, এ বড়ো আশ্চর্য। অথচ আমার হতভাগ্য পিতাকে দেখেছি, তিনি সংকুচিত। কোথায় যেন দ্বিধা, বাধা, তিনি তাঁর যোগ্যতার ন্যায্য প্রাপ্য নিতেও কুণ্ঠিত। শুনেছি, তিনি ইচ্ছে করলে দেশখ্যাত হতে পারতেন, নেতা বা মন্ত্রী। কিন্তু তিনি তা হননি। কেন এ ব্যতিক্রম ?

হুজুর, বৈরাগ্য তাঁর ছিল না, এ আমার জানা। নির্মোহ ছিলেন ? তাও মনে হয়নি। এবং নির্লিপ্ত ? না, তিনি আমরণ লিপ্ত ছিলেন। তাহলে ?

ধর্মাবতার! আমার পিতা তাঁর দিনপঞ্জীর একস্থানে লিখেছেন ঃ

> 'এই সংসারে অধিকার কেহ কাহাকেও দেয় না, আমি সেই সত্য সবিশেষ অবগত আছি এবং জানি, অধিকার আপন যোগ্যতার বিনিময়ে অর্জন করিতে হয়। সেই যোগ্যতা আমার আছে, ছিল, তবুও আমি সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছি। আমার পরিচিত জনমাত্রেই ইহাতে বিস্মিত হইয়াছেন, সেই বিস্ময়ে অপরিচিতরাও আক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়াছি। ভাগ্যে বৈকি! আমি কিন্তু আমার ক্ষোভ ও আমার দুঃখকে অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া প্রকাশ্যে মুখ টিপিয়া হাসিয়াছি। সেই মুখটেপা হাসির সহিত আমার জন্মসূত্রে পাওয়া কান্না বড় বেশি হাত ধরাধরি করিয়া রহিয়াছে।'

ন্যায়াধীশ ! মানুষের ত্রুটিই, তার দুর্বলতাই তাকে কাবু করে। সে ত্রুটি নিজকৃত না অন্যকৃত সেটা একটা মূল্যবান প্রশ্ন বটে। অবশ্য বেশির ভাগ মানুষ-ই অন্যকৃত ত্রুটির দায় মানতে রাজী নয়। কিন্তু আশ্চর্য ! আমার পিতা, ত্রুটি মাত্রকেই তুল্যমূল্য জ্ঞান করেছিলেন। এখানেই আমার বিস্ময়।

হুজুর, আমার পিতার জন্ম-বৃত্তান্ত সংগ্রহ বড়ো মজার।

o

আমি তখন দ্রুত নামছি। এ নামায় সাহায্য করেছে আমার বাল্যবন্ধু অমল।

হুজুর, আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন. বন্ধু মানেই সাহস। অমল আমার ভয় ভাঙিয়ে দুঃসাহসী করে তুলল।

তখন আমার ফেরারী জীবনের কয়েকমাস পেরিয়ে গেছে। আমি মহানগরীতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছি। খরচ যোগাচ্ছেন সরকার কাকা অবশ্যই আমার বিষয়-সম্পত্তি থেকে।

তখন রাত ফুরানো তেমন কিছু নয়, কিন্তু দিন? বড়ো একঘেয়ে, বড়ো বিরক্তিকর। তখন আমরা ফূর্তির খোঁজে শহর-শহরতলী তন্ন তন্ন করে ফিরছি। শেষতকু পাড়ায়। জরিপ করতে করতে একদিন সবচে' নামী বাড়ীতে ঢুকলুম। সেখানে তিরিশ ঘর বেশ্যা। যেন রূপের বাজার। এঘর-ওঘর-সেঘর—হুজুর, আমরা তো ঠাঁই চাই নে, বাঁধা পড়তেও না, ফূর্তি চাই। আর আরো ফূর্তির জন্য মুখ বদল নেশায় দাঁড়িয়ে গেল।

এক রাতে একটি মেয়ের সঙ্গে কথায় কথায় জানলুম, এ বাড়ীর যিনি মালিক তিনি যথার্থ ভদ্রলোক। এ বাড়ীর মেয়েদের উনি নিজের মেয়ের মতোই দেখেন।

তাই নাকি ! আমি বিস্মিত হয়ে শুধলুম, ভদ্রলোকের নাম ?

কি ? আমি উঠে বসলুম। আমার চমকানোতে মেয়েটা হেসে উঠল।

বলল, ছ্যাঁকা লাগল নাকি ?

আমি হেসে স্থির হলুম। বললুম, না, তা নয়।

আমার মুখ চোখ কি ফ্যাকাশে হয়েছে ? আমি কি ভয় পেয়েছি ? প্রাণপণ চেষ্টায় স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলুম।

তবে ?

বললুম, এতো মোক্ষদাসুন্দরীর বাড়ী। তাহলে ভদ্রলোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ?

মেয়েটা আমার এতক্ষণের খুনসুড়িতে মজা পেয়েছে হয়ত, এ লাইনে হয়ত ততো পুরনো নয়, সে আমার কৌতূহল দেখে বলল, আমি ঠিক জানিনে, দাঁড়ান মাকে ডাকছি।

মা ?—আমার কথা না শুনেই সে দরজা খুলে বেরোতে বেরোতে বললে, হ্যাঁ গো, মা সবই জানে।

আমার কেমন যেন ধারণা হয়েছিল, যে বাড়ীতে আমাদের বাসা ছিল, ছোট বেলায় যে বাড়ীতে বার কয় বাবার সঙ্গে এসে উঠেছিলুম, সেই তিনতলা বাড়ীটাই আমাদের। কে আমাকে এমন ভুল বুঝিয়েছিল ? সরকার কাকা কি ? আচ্ছা, এ বাড়ীর দলিল কি আমি দেখি নি ? নাকি ঠিক খেয়াল করি নি ? কিছু একটা অবিশ্যি হবে, নতুবা—

সশব্দে দরজা খুলে মেয়েটার মা থপ্ থপ্ পা ফেলে ঘরে ঢুকেই হুঙ্কার ;—ফুর্তি করতে এসে বাছা এসব কি এ্যাঁ, এমন তো কখনো শুনি নি। বলি আদার ব্যাপারীর—

কথা শেষ করতে না দিয়ে সবিনয়ে বললুম, তা না মাসি, শুধু কৌতূহল থেকে—

না বাছা, এত বেশী কৌতূহল-টৌতূহল আমি পছন্দ করি নে। এতো আর বড় মুখ করে পরিচয় দেবার মতো জায়গা নয় যে নাম-ধাম-গোত্র বলে দেব। তাছাড়া তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তো এক রাত্তিরের, তাহলে বাপু, অত খবর নেওয়ার শখ কেন ? তুমি কি এ মেয়েকে—

আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বললুম, না না তা কেন ? দোষ হয়েছে,

ঘাট মানছি। কথায় কথা উঠল, নইলে—প্রায় কানে হাত রাখার অবস্থা।

এই চেঁচামেচি শুনে পাশের ঘর থেকে অমল তড়িঘড়ি ছুটে এল। মাসী তখনো গজ গজ করছে। একসময় চলে গেল। আমার ফুর্তিও।

অমল সব শুনে বললে, তোর যতো সব উটকো কৌতূহল। কি দরকার ছিল ?

আমি অমলের মুখের দিকে তাকালুম। হ্যাঁ, ও আমার বন্ধু, আমি নয়।

হিসেবের টাকা অমলেব হাতে দিতে দিতে বললুম, তুই বোস, আমি এক্ষুণি আসছি। ওকে কোন কথা বলতে না দিয়ে তর তর করে নেমে এলুম।

০

ধর্মাবতার। আমার এক পিসি আছেন। বাবার ধর্মবোন। তার ঠিকানা আমার জানা ছিল। অবশ্যই তার কাছে সঠিক খবর পাবো এ বিশ্বাসে সে রাতে পড়িমরি ছুটলুম। যখন দোতলায় উঠলুম তখন আমি রীতিমত হাঁফাচ্ছি।

রাত কতো হলো ?

কে জানে ?

কে জেগে আছে ?

জানি না।

আমি সুমুখে যে দরজা পেলুম তার কড়া ধরে ঝাঁকুনি দিলুম। কে যেন পড়িমরি ছুটে এসে দরজা খুলল। সম্মুখেই পিসি। আমাকে এত রাতে এমন অবস্থায় দেখে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। মুখে চোখে আতঙ্ক।

তুমি ?

আমি ঘরে ঢুকে দরজা দিলুম। সামনে যে চেয়ার পেলুম তাতেই বসে

পড়লুম। বললুম, এক গ্লাস জল।

পিসি কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনলেন।

জল খেতে খেতে আমার উত্তেজনা একটু কমল। আমি পিসির দিকে তাকালুম। চোখাচোখি হল।

এভাবে কোত্থেকে আসছো?

যেন অনেক দূর থেকে কেউ আমাকে শুধোচ্ছে। আমি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললুম, আমি একটি জরুরী ব্যাপারে এসেছি।

পিসি আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। খুব শান্ত গলায় বললেন, বলো।

আমি একটি সত্য জানতে এসেছি।

কি? পিসির মুখ মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল। সে মুহূর্তের জন্যে।

বললে, তার আর তাড়া কি? তুমি কি কিছু খেয়েছো?

আমি তার কথা এড়িয়ে বললুম, কথা দিন, সত্য বলবেন?

আবার মুখের রঙ বদলাল। তিনি বললেন, মিথ্যে বলার কি আছে? কিন্তু অতো তাড়া কিসের?

আমার সময় নেই।

তাহলে, তিনি মৃদু হাসলেন, জিজ্ঞেস করো।

আপনি কে?

আমি তোমার বাবার বোন, তোমার পিসি। কণ্ঠস্বর স্থির, অকম্প।

আমার বাবার বোন এত সুন্দরী! আমি চোখ নামালুম।

ধর্মবোন. না সহোদরা?

সে কি! তেমন তফাৎ কোথায়?

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালুম। উনি হাসছেন। বললেন, এত রাতে হঠাৎ এসে—

আমি সত্য জবাব শুনতে চাইছি। আমার কণ্ঠস্বরে উনি সত্যি চমকালেন।

বললেন, সহোদরা।

নিশ্চয়ই জন্মদাতা এক নন ?

তিনি অবলীলায় ঘাড় নাড়লেন ।

তাহলে মোক্ষদাসুন্দরীই আপনাদের মা ।

তিনি অপলক তাকিয়ে হাসলেন । সে হাসিতে কোন জড়তা নেই, কোন কুণ্ঠা । বড় অকপট সে হাসি । আমার ভালো লাগল ।

শুধলেন, তোমার ঘৃণা হচ্ছে ?

আমি তাঁর দিকে অপলক তাকিয়ে আছি । তাঁর সারা মুখে আশ্চর্য কমনীয়তা । চোখের দৃষ্টিতে বড়ো বেশী মমতা । এ নিশ্চয়ই উচ্ছৃঙ্খলতার সম্পূর্ণ উল্টো পিঠের । কিন্তু সে কী করে সম্ভব ? জন্মে যার কলঙ্ক তাঁর অকলঙ্কতা কি আশ্চর্য নয় ? আমি বিমূঢ় ।

উনি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত রাখলেন । বললেন, জন্মে কারো হাত থাকে না ।

সে তো সত্যি । আমার কণ্ঠস্বর আমার কাছেই অপরিচিত মনে হল ।

তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ ?

আমি ? আমতা আমতা করে বললুম, আমি ক্ষুব্ধ ।

খুবই স্বাভাবিক । আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, তবু সত্যের মুখোমুখি মানুষকে হতেই হয়, তার দুঃখের মুখোমুখিও ।

এত পরিশীলিত কথা, উচ্চারণ, বাক্যালাপ—আমি মাথা নীচু করলুম ।

আমি সেবারে তোমাকে এখানে আসতে বলেছিলুম তোমাকে সব কথা জানানোর জন্যে । দাদা আমাকে সে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন ।

কী ? আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট । শুধোলুম, বাবার মৃত্যু কি বাবার জানা ছিল ?

পিসিমা তেমনি স্থির গলায় বললেন, দাদার উপায় ছিল না ।

কেন ?

আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না, পারলেও তুমি ঠিক মানতে পারবে না ।

কেন ?

আসলে তুমি রক্তের সম্পর্কে বাঁধা। তোমাকে অবশ্যই সইতে হবে, কিন্তু সমাজ ত তা নয়।

সে কি লজ্জায়? কাকে লজ্জা? তাহলে উনি, আমি বড় হচ্ছি জেনেও পাড়ার মধ্যে ঐ বাড়ী রেখে দিলেন কেন? কেন পিসিকে দায়িত্ব দিলেন আমাকে সব কিছু জানাতে? ওঁর কি ভয় ছিল না আমিও আত্মহত্যা করতে পারি? না, নিশ্চয়ই সে ভয় তিনি করেন নি? কেন? আমার লোভ কি তার চেনা ছিল? হয়ত! তাহলে বাবা আত্মহত্যা করেছেন। আশ্চর্য! এতো বুঝেও উনি—

কিছু বলছো?

আমি নড়ে চড়ে বসলুম। বললুম, না, ও কিছু না। থেমে শুধোলুম, আচ্ছা, সুদর্শন রায় কে?

পিসির চোখ যেন মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল। হাতে চেয়ারের কোনা চেপে ধরে স্থির হয়ে বললেন, তোমার বাবার সৎ ভাই।

মানে?

মানে তোমার ঠাকুর্দার বৈধ ছেলে। একটু থামলেন। তোমার দুর্ভাগ্যের কথা আমি শুনেছি।

শুনেছেন? আমার মাথা নীচু হল। বললুম, আমি উঠি।

উনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন। এত রাতে তুমি কোথায় যাবে?

আমি? ওঁর মুখের দিকে তাকালুম। চোখাচোখি হল। মনে হল উনি তন্ন তন্ন করে কি যেন খুঁজছেন? কী?

আচ্ছা, আমার দৃষ্টিতে কি ছিল, সহানুভূতি? করুণা? আমি জানি না। শুধু মনে আছে, বুকের ভেতরের কোন ঝড়ের শব্দ আমি শুনি নি, কোন বজ্রপাতও না। আর ওঁর চোখে? অবশ্যই মমতা ছিল, স্নেহ, ভালোবাসাও।

বড় শান্ত গলায় বলেছি, আবার আসবো।

ওঁর চোখে অবিশ্বাস। আর আসছো! উনি হাসলেন।

বললুম, অবশ্যই আসবো।

উনি চোখ নামালেন। আমি দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম।

রাত কতো ?

কে জানে!

কে জেগে আছে ?

পেছন ফিরে মাথা তুলতেই দরজার আলোতে আবছা পিসির মুখ। পিসিমা জেগে আছেন, জেগে থাকবেন। আমি তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে এসেছি। নাকি, তিনি সারাক্ষণ আমার আসার অপেক্ষায় জেগেই ছিলেন ?

ন্যায়াধীশ! ও'র জেগে থাকা কি খুবই জরুরী ?

০

ধর্মাবতার! একসময়ে মানুষ উলঙ্গ ছিল, সে কি দেহে, কি মনে। ক্রমান্বয় সভ্যতা মানুষকে ঢাকতে শেখাল। সে শিখল নিজের শরীরকে ঢাকতে, নিজের মনকে আড়াল করতে। এমনি ঢাকাঢাকির খেলায় এমন একটি স্তরে এসে পেঁছিল যে, এখন মানুষকে ছোঁয়া বড়ো শক্ত, তাকে চেনা বড়ো কঠিন। এখন বোঝা যায় না, সত্যি সে কি চায় ? শুভ না অশুভ ? সুন্দর না অসুন্দর ? কল্যাণ না অকল্যাণ ? বিশ্বাস করুন, তার মুখ তথা উচ্চারণ তার মনের প্রতিফলন কিনা নিকটজনও তা জানে না। এমন কি নিজেও না।

হুজুর! মানুষ এখন মরীয়া। সে বড়ো অসহায়।

আচ্ছা, এর সবটুকু কি নিশ্চিত প্রয়োজনে ?

হয়ত!

আমি সঠিক জানিনে। তবে আমার মনে হয়, প্রয়োজন-ই মানুষকে প্রলোভিত করে।

ন্যায়াধীশ! আমি জানি, আপনি বলবেন, 'প্রয়োজন' কথাটাই আপেক্ষিক।

সন্দেহ নেই। কিন্তু হুজুর! আমার প্রয়োজনের প্রথম বিচারক ত অন্য

কেউ হতে পারেন না।

আমি কি মিথ্যে বললুম?

o

আমি যখন আমার আপন অস্তিত্বের মূলে হাত রাখা রাতে আমার আপন চিন্তা ও চিন্তাহীনতায় বিমূঢ়, যখন স্তব্ধ মধ্যরাতে কিছুতেই আমার সঠিক ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছিনে, যখন মনে হচ্ছে পথই আমার একমাত্র অবলম্বন, আশ্রয়, তখন পথ আমাকে স্টেশানে পৌঁছে দিল।

যে ট্রেন প্রথম ছাড়লে তাতেই উঠে বসলুম।

এখন কোন দিকে?

তুমি কোথায় চলেছ?

ধর্মাবতার! এই আমি আমার জন্মদাতার মৃত্যু প্রার্থনা করেছিলুম, আমার গর্ভধারিণীরও। আমি অবাধ অধিকার চেয়েছিলুম, অগাধ ক্ষমতা।

সবই হাতে পেয়েছিলুম হুজুর, কিন্তু একি হল?

আমি কোথায় চলেছি?

একবার মনে হল, নেমে আপনার কাছে ছুটে যাই, যা সত্য তা উচ্চারণ করি অকপটে, বলি, ময়না আমাকে প্রলুব্ধ করেছে এ যেমন সত্য, আমার সদ্যলব্ধ যৌবনের ইচ্ছে ও লোভ আমাকে ময়নার দিকে ঠেলে দিয়েছে, এও মিথ্যে নয়। এবং এই পাপেচ্ছা—

ন্যায়াধীশ! 'পাপ' কথাটা উচ্চারণ করতে আমার বাধছে। আপনি জানেন, আমার জবানবন্দীর সুরুতে আমি 'অনিবার্য' কথাটা ব্যবহার করেছিলুম। কিন্তু এখন নাচার। এই শব্দ ছাড়া এ মুহূর্তে বিকল্প কোন শব্দ মনে আসছে না, হয়ত এ শব্দের বিকল্প নেই, থাকলেও তা দিয়ে যা বোঝাব তা কেউ-ই বুঝবে না।

হ্যাঁ হুজুর, এ পাপেচ্ছা আমার রক্তে। উফ্—

ধর্মাবতার! আমার নামা হয় নি, ফলে, আমি ক্রমে ক্রমে আপনার তফাতে সরে গেছি। অনেক তফাতে।

এ কি ভয়ে? ঘৃণায়? না কি এ নিস্পৃহা? নির্মোহ?

০

ইতিমধ্যে প্রচুর ঘোরা হলো, দেখাও। দুর্গ থেকে বেরিয়ে দুর্গে, প্রাসাদ থেকে প্রাসাদে। গেলুম মহল থেকে মহলে। ডিঙোলুম অজস্র ধ্বংসস্তূপ, দেখলুম অসংখ্য ভগ্নাবশেষ। সবই ঐতিহাসিক।

গাইড বলে গেলেন, কোন শতাব্দীতে কারা ছিলেন, কিভাবে তাঁদের রাজত্বের শেষ হল, কারা আবার নতুন করে রাজ্যপত্তন করলেন। বললেন, তাঁদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, মানাভিমানের কিছু গল্প; বাসনাতাড়িত কিছু স্খলন পতনের নির্মম কাহিনী; হিংসা-দ্বেষ-লোভ জর্জর অধিকারের কিছু রক্তাক্ত ইতিহাস। মনে হলো, আমি যেন সেদিনের সেই মানুষগুলোকে স্পষ্টতঃ চাক্ষুষ করছি, অনুভবে ধরা পড়ছে তাঁদের তীব্র-তীক্ষ্ণ ইচ্ছেগুলোও। বুঝতে পারছি, আমি তাঁদেরই একজন, আমি এখনো আছি, অথচ কঠিন সময় ওঁদের চিরতরে মুছে দিয়েছে; কিন্তু এই সর্বংসহা বসুন্ধরা, এই ভূমিরূপিনী মা তার চিহ্ন অঙ্গে ধরে রেখেছে, আরো কাল ধরে রাখবে।

হায়রে মমতা!

ধর্মাবতার! রচনা শিক্ষায় পড়েছিলুম, দেশভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ।

হুজুর! এতে কি ভূগোলের জ্ঞান বাড়ে? ইতিহাসের বোধ?

কে জানে!

আমার কিন্তু মনে হয়েছে, যদি যথার্থ সত্য কিছু এ ভ্রমণ থেকে অর্জন করা যায়, তা হলো, বৈরাগ্য, নির্মোহ, নিস্পৃহা। ওই ধ্বংসস্তূপ ও প্রাসাদ কি একথা শেখায় না, এ জগতের কিছুই স্থায়ী নয়, সবই নশ্বর।

ন্যায়াধীশ! এ শিক্ষা মানুষ নেয় নি, নেয় না, কারণ তারপরও ভূমি

থাকে। এবং সেই ভূমির স্বত্বের দাবীতেই মানুষ লড়ে, ছোটে, কাড়ে।

হুজুর! এই অত্যাশ্চর্যই মানুষ।

প্রাজ্ঞজনেরা যতোই বলুন, তারপরও এ জগৎ স্বপ্ন নয়, এ জীবন মায়া নয়, মতিভ্রম নয়, মানুষও বৈরাগী নয়,—হলে, সব কোলাহল কবে থেমে যেতো।

কিন্তু হুজুর! না, মানুষ থামে নি। সে তার পাপ-পুণ্য, তার লোভালোভ, তার বাসনা-কামনা, তার সত্যাসত্য, তার সুখ-দুঃখ, তার অনন্ত ইচ্ছে-অনিচ্ছে নিয়ে চলমান।

ধর্মাবতার! আমি সেই চলিষ্ণু মানুষেরই বংশধর। ঘৃণা আমাকে থামাতে পারে না, ভয় না, নিস্পৃহাও নয়।

০

হুজুর! আমার পুঁজি যা সে-রাতের অঘটনের পরেও অবশিষ্ট ছিল তা ফুরলো। দিন চলা ভার। অগত্যা অনেক তদ্বির তদারক, অনেক কাকুতি-মিনতির পরে এক নামী ঠিকেদারের অধীনে কাজ পেলুম। তাঁর কাজ গ্রামে গ্রামে নলকূপ বসানো।

ধর্মাবতার! এ অঞ্চল বড়ো রুক্ষ। প্রায় মরুভূমির মতো। দু দশটা বৃক্ষ তথা বনস্পতি এখানে-ওখানে। সেই বৃক্ষ ঘিরে কিছু বসত, বড়ো দূরে দূরে, মাঝে ধু ধু মাঠ চিরে চলে গেছে পায়ে চলার রাস্তা, সেও ধুলোময়।

এখানের জীবন বড়ো কষ্টের। মানুষগুলো পরিশ্রমী, কিন্তু প্রকৃতি বড়ো কৃপণা।

শুনেছি, অরণ্য মেঘ ডেকে আনে, আর মেঘ দেয় বৃষ্টি। এখানে অরণ্য নেই, অতএব মেঘ আসে না, বৃষ্টিও না। এখানে অনেক খুঁড়লে তবে জল। এখানে এসেই বুঝলুম, জলের অপর নাম জীবন কেন?

প্রচুর তদ্বির-তদারকির পরে, প্রচুর আবেদন-নিবেদনের শেষে সরকারের

নজর পড়ল। সরেজমিনে যাচাই করে দেখা গেল, একুশটা পাইপ বসালে তবেই স্থায়ী জল। ব্যাপারটা খরচের। শেষপর্যন্ত স্থির হল, অনেক অসম্ভব, তবু কিছু হোক। আমার মালিক সেই কিছুর ঠিকেদারী পেলেন।

একটা দুটো বসাতেই ধরা পড়ল, ন'টা পাইপ পুতলেও জল উঠছে। আমার মালিক পরের পাইপগুলো ন'টাতেই বসাতে লাগলেন।

আমাদের ওখানে হুজুর, চারটেতেই জল মেলে। আমি প্রায় ঘরে ঘরেই ও কল দেখেছি। ও জল পানযোগ্য অবশ্যই, কিন্তু কিছুতেই সংরক্ষণ-যোগ্য নয়। ধরে রেখেছেন কি, লাল একটা সর পড়বেই। ওতে কাপড় কাঁচা যায় না, রান্না করা যায় না, বড় ভারী। তবু এতে খরচ কম, খাটুনি কম। ধর্মাবতার! মানুষের মজার স্বভাবের এও একটা। সে জানে এতে ক্ষতি হবে শরীরের, কাজ বাড়বে সংসারের, এমন কি খুব দ্রুত কল নষ্ট হবেই হবে, তবু সস্তার পথ সে ছাড়ে না। এ জীবনের সর্বক্ষেত্রে। বেশীর ভাগ লোক-ই চারটে বসিয়ে দায়মুক্ত অর্থাৎ প্রথম পাওয়াটাই শেষ পাওয়া। তাতেই মজে থাকে। অথচ হুজুর, সেই গল্পটা মনে করুন, এগোতে এগোতে সে একটা লোহার খনি পেলে। লোহার দাম ত কম নয়, তবু সে ভাবলে, যখন লোহা পেলুম, তখন আরেকটু এগিয়ে দেখি না কেন। আরো যেতেই সে একটা তামার খনি পেলে। সেখানে সে খুশিতে থেমে যেতে পারতো। কিন্তু সে লোকটা হুজুর কিছুতেই থামলো না। আরো এগোতে রুপো, তারও পরে সোনা, আরো পরে হীরে……

হজুর! মানুষকেই যেতে হয়, কিন্তু বেশীর ভাগই যায় না, কেউ কেউ যায়। হুজুর! যাঁরা যায় তাঁরাই মানুষের মধ্যে বিস্ময়।

এই দেখুন, কি বলতে কি বলছি!

মালিককে বললুম, অনেক দুঃখের পরে ওরা এতদিনে যথার্থ জলের মুখ দেখছে, আপনি ওদের এ সর্বনাশ করবেন না।

কি ?—মালিক আমার স্পর্ধায় বিস্মিত। বললেন, হাতে পায়ে ধরে কাজ পেয়ে তুমি এখন তোমার অধিকারের বাইরে—

আমি কথা টেনে নিয়ে বললুম, আপনি সত্যি বলেছেন। এ আমার বলা উচিত নয়, হচ্ছে না।

তাহলে তুমি চুপ করো। তোমার আজেবাজে কথা শোনার সময় আমার নেই।

আমি সবিনয়ে বললুম, আমাকে আপনি অসময়ে আশ্রয় দিয়েছেন, এ জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনি এই অসহায় মানুষগুলোর এতো বড়ো সর্বনাশ করবেন ?

কি বললে ? সর্বনাশ করছি ? এ জলের ব্যবস্থা কে করে দিলে ?

কথাটা সত্যি। ওঁরই দৌলতে এ পরিকল্পনা।

তাই ত বলছি, আপনি নিজে দীর্ঘদিন এত কষ্ট করেও এমন সর্বনাশ করছেন কেন ?

উনি রেগে বললেন, কিছু তো ছিল না, এ যা করছি এও কি কম কিছু ?

বললুম, গোড়া কেটে আগায় জল। এতে কি কিছু বাঁচবে ?

সে তোমার দেখার কথা নয়। তুমি তোমার কাজে যাও।

আমি ঠায় গোঁয়ারের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। এ আমার পক্ষে অভাবিত। আমার মধ্যে এ কে ? এতোদিন এ কোথায় ছিল ?

আমি বললুম, আমি কাজে ইস্তফা দিলুম।

উনি হেসে শুধলেন, খাবে কি ?

কোন জবাব দিলুম না। কারণ, সে ভাবনায় আমি তখনো উত্যক্ত নই। আমি নিজের ডেরায় ফিরে কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত জানিয়ে চিঠি দিলুম। এখন প্রতীক্ষা।

একদিন, দুদিন। তিনদিনের দিন মালিকের হাতে আমার চিঠিটা দেখে আমি বিমূঢ়। তিনি সে চিঠি কুঁচি কুঁচি করে আমার সুমুখে ছিঁড়ে ফেললেন।

অর্থাৎ—

মালিকের ক্রোধের আগুনে আমাকে সে এলাকা ছেড়ে পালাতে হল। হুজুর, তারপরের অনেকগুলো বছরে কখনো মুটে, কখনো মজুর, কখনো দোকানী। সংসার করলুম না করার মতো, সন্ন্যেসী হলুম, সবশেষে ডাকাত। সর্বত্র সেই এক খেলা। কে কার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে,—সে মজুরীর নামে হোক, লাভের নামে হোক, লুটের নামে হোক। এ এক ভালো মজা!

ধরুন, আপনার আইন-কানুন। যে আইন মজুরের ন্যায্য প্রাপ্য ঠকাতে সাহায্য করে, সে আইনই মজুরকে মজুরীর দাবীতে লড়াইয়ের অধিকার দেয়। যে আইন অনেককে ঠকিয়ে সঞ্চয়ে সাহায্য করে, সেই আইন-ই চোরকে জেলে পোরে। তা ও বা কেন, যে আইন মদের দোকান খোলার অনুমতি দেয়, সে আইনই মাতালকে রাস্তায় পেলে হাতকড়া পরায়। হুজুর, এ কী মজা নয়?

ধর্মাবতার! এ মজা যখন আমার হাত ধরল তখন আমিও মরীয়া। আমি ডুবলুম এবং জানলুম, প্রয়োজনে মানুষ বড়ো নির্দয়, বড়ো নির্মম। এ মানুষের একদিক। আবার অন্যদিকে, এতো সতর্কতা সত্ত্বেও সে বড়ো অসহায়,—সে কিছুতেই জানে না, জানতে পারে না পরমুহূর্তে কি কি ঘটবে? তার স্বেদে-রক্তে অর্জিত নিশ্চিন্ততা কতোক্ষণের? তার মানে এ নয় যে, সে থেমে যেতে পারে? না হুজুর, যদি আত্মহননে সে অরাজী হয়, তাহলে তাকে যেতে হবেই, সে যতো কাছে, যতো দূরেই হোক; কিছুতেই থামা চলবে না।

আমিও চলতে চলতে একদিন মুখোমুখী হলুম সেই বৃদ্ধের, যাঁর বয়স ঊনশত, যাঁর নাম ভগবানপ্রসাদ, যাঁর স্ত্রী অসংখ্য, পুত্র-পৌত্রাদি অগনন, যিনি এক বিশাল সবুজ উপত্যকার অধীশ্বর। যেখানে একদিন কোন মানুষের চিহ্ন ছিল না, সেখানে তিনি মানুষের প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন, প্রাণের অফুরন্ত উৎসব।

ভগবানপ্রসাদের উপাখ্যান

চতুর্দিকে রুক্ষ পাথুরে পাহাড়ের সারি। মধ্যে বিশাল উপত্যকা জুড়ে আগাছা আর আগাছা। মাঝখান চিরে বয়ে গেছে এক পাহাড়ী নদী।

দুর্ধর্ষ ডাকাতের ছেলে ভগবানপ্রসাদের কথা ছিল ডাকাত হবার। কিন্তু নিরন্তর গা-ঢাকা দিয়ে বেড়ানো পিতার সঙ্গী পুত্রের প্রার্থনা ছিল স্থায়ী আস্তানার। বিরোধের সূত্র এই। কালে তাই-ই পুত্রকে প্রলুব্ধ করল বিচ্ছিন্ন হতে। পিতার লুণ্ঠিতা এক হতভাগিনীর হাত ধরে সে বিচ্ছিন্ন হল।

সাক্ষাৎ শমন পিতার তফাতে যাবার তাগিদে সে দুঃসাহসে অরণ্যের আড়াল নিল। অনেক দিন-রাত পার হলে তারা এসে পৌঁছল এই উপত্যকায়। চোখ জুড়িয়ে গেল। মন বললে, ঘর বাঁধি ত এখানেই।

ভগবান আর লখিয়া, দুই উদ্ভিন্নযৌবন যুবক-যুবতী ওদের জবরদস্ত হাতে মাটিতে মানুষের চিহ্ন রাখল। বন উড়ে যাচ্ছে, মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত। নদী জল ধরে দিতেই মৃত্তিকা গর্ভিনী। একদিন অফুরন্ত প্রসবে ওদের আঙিনা ধন্য হল।

প্রতিদিনই ওদের অধিকারের সীমা বাড়ছে, আরণ্য সরে যাচ্ছে।

এমনি সময়ে, এক মধ্যরাতে, ওরা এক অলৌকিক কণ্ঠস্বরে উঠে বসল। যেখানে জন্তু-জানোয়ার, পাখ-পাখালী, কীট, পতঙ্গ সরীসৃপ ছাড়া আর কিছুই নেই, সেখানে মানুষের কণ্ঠস্বর! প্রথমে ভগবানপ্রসাদের মনে হল, বুঝি বা তার দুরন্ত পিতাই! যদি তাই-ই হয় তাহলে—

ভগবানপ্রসাদ মুহূর্তে মনস্থির করে টাঙি হাতে নিল। লখিয়াকে বলল, মশাল ধরিয়ে তুই আগে যা, আমি শেষ দেখব।

মশালের আলোয় যে মানুষটা স্পষ্ট, সে ভগবানপ্রসাদের অচেনা। ইচ্ছে হয়েছিল শুধোয়, সে কে? কোত্থেকে আসছে? পরমুহূর্তে মনে হল, কি লাভ? সে যা বলবে তা যে সত্য বলবে তার ঠিক কি? অতএব—

বললুম, উঠে এসো।

সে উঠে এলো।

হ্যাঁ মানুষই। ব্যস্, আর কি! একজন সঙ্গী ত হলো।

পরদিন তার চুল দাড়ি নিজেই ছাঁটলুম। তাগড়াই এক জোয়ান।

সে বললে, আমি সব কাজ জানি।

ব্যস্, ব্যস্। লখিয়াকে শুধোলুম, ওকে রাখি?

ওর চোখে-মুখে খুসি। বললে, খুব ভালো হবে।

খু-উ-ব—আমি হাসলুম। মেয়ে মানুষের মন! প্রথমে ভাবলুম, আমাদের দুজনের কথা বেশ কিছুদিন হল ফুরিয়ে এসেছে, নতুন সঙ্গী একজন হলে মন্দ কি! আবার মনে হল, ওর মনে কোন পাপ নেই তো?

জিজ্ঞেস করলুম, নাম কি?

বললে, মহাদেও।

ঠিক আছে মহাদেও, তুমি থাকো।

দিন যায়, মাস যায়। একদিন মনে হল, লখিয়া মহাদেওর দিকে বেশ ঝুঁকেছে। ভাবলুম, মন্দ কি! লখিয়ার সুমুখেই বললুম, তুই যদি রাজী থাকিস্, তুই আমাদের দু'জনার-ই।

লখিয়া হেসে চোখ পাকাল।

আমি ভেবেছিলুম, ও বুঝি বা কেঁদে কেটে একসা হবে। না তার কিছুই হল না। সে কোমরে ঢেউ তুলে জল আনতে চলে গেল।

মহাদেও বললে, আমি কি ওকে সাহায্য করব ?
হেসে বললুম, যাও।
যখন ফিরল তখন রাত হয়েছে। দুজনে উস্কুখুস্কু। ক্লান্তও।
প্রথম প্রথম বাড়াবাড়ি হয়ই !

মন খারাপ হল। যদিও লখিয়া আমার বিয়ে করা বউ নয়, তবু এন্দিন ত ওর ওপর অধিকার একা আমার-ই ছিল। এখন ? আসলে পুরোন রীত-নীত আমার রক্তে, সংস্কারে। হঠাৎ মাঠের দিকে নজর পড়তে মনে হল, সে তো ফেলে এসেছি। ওসব ভাবনা আবার কেন ? আমি মন ফেরাতে চাইলুম। ভাবলুম, এই খাঁ খাঁ রাজ্যে একটি মানুষ ত বাড়ল, সঙ্গী ত হল।
না, মহাদেও থাক।
বছর ঘুরল।
আমরা দু দু'টো পুরুষ মানুষ, তবু লখিয়া একটি মানুষ বাড়াতে পারল না।
এ কী মেয়েমানুষ ! আগাছা ভর্তি জমিতে একবারের কষ্টে ফসল ফলালুম, আর এ মেয়েমানুষের এতর পরেও কিচ্ছু নেই। সুমসাম্ !
একদিন আমি ওদের কিছু না বলে ডুব দিলুম।

দিন কয় পরে সরস্বতীয়া আর রুক্মিনীকে নিয়ে ফিরে এলুম। লখিয়া কিছু বলল না। সে রাতে মহাদেওকে নিয়ে সে উধাও হয়ে গেল।
ভগবানের ইচ্ছে নয় তাই, তিন কিছুতেই পাঁচ হল না। কিন্তু সে কদ্দিন ? বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পাঁচ। পরের বছরে সাত, তারপরে নয়…
মানুষ বাড়ছে। আরো মানুষ চাই। কাজ বাড়ছে। আবার দুটো

মেয়েমানুষ ধরে নিয়ে এলুম। এখন আমার বউ চব্বিশটা। পুত্র কন্যার সংখ্যা অনেক। ওরা বড় হতেই সরস্বতীয়ার ছেলের সঙ্গে রুকিনীর মেয়ের, ভানুমতীর মেয়ের সঙ্গে রুকিনীর ছেলের, সব জোড় বাঁধিয়ে দিলুম।

একদিন লখিয়া ফিরে এল, মহাদেওও। সঙ্গে একটি মেয়ে, একটি ছেলে।

মানুষ বাড়ছে, বন কমছে।

এমনি অনেকগুলো বছর পার হলে, একদিন, তখন বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে, দাঁত পড়ছে—হঠাৎ, মহাদেওর সঙ্গে কয়েকজন আমার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মুখ করতে লাগল। এরকমটি কখনো ঘটেনি। এদ্দিন আমি যা বলেছি, বয়সের জন্যে হোক, ভালোবাসায় হোক কেউ কোনদিন মুখ করেনি। আমিও কাউকে তার করা না-করায় বাধা দিইনি। শুধু বলেছি, এ জীবন এ মাঠে বড়ো কষ্টে বয়ে এনেছি, একে তোরা কেউ-ই নষ্ট করবি নে।

সবাই সে কথা বুঝেছে, মেনে নিয়েছে। হঠাৎ এমন জোট পাকানো? কেমন যেন খারাপ মনে হল।

আমার বাপ আমার চেনা। তাঁকে দেখেছি দল ঠিক রাখতে নিরন্তর ঘুষ দিতে। ওকে হাসি ছুঁড়ে দিল তো, তাকে মোহর। ওকে মেয়েমানুষ লেলিয়ে দিলে তো তাকে দারু। তারপরও বেগড়বাই দেখেছে কি খুন।

খুন?

আমি পাগলের মতো মাঠের মধ্যে দিয়ে প্রাণপণে ছুটলুম। এক সময় ক্লান্ত হলে মন দিলুম কাজের খোঁজে। এ কী! আখের গোড়ায় এখনো মাটি দেয়নি? ধানে নিড়ানী? ডালগুলো মাঠেই ফুটছে? কাঠকুটো পড়ে আছে এখানে সেখানে? মাথায় আগুন

ধরে গেল।

সবাইকে ডেকে পাঠালুম, ব্যাপার কি জানতে।

কেউ-ই এলো না।

তার মানে ?

হ্যাঁ, আমার এত সব না ভাবলেও চলে যেতো, তবু কেন জানিনে, এই প্রথম আমার অহংকারে লাগল। মনে হল, এ সব-ই ত আমার করা, আমার-ই সব, তাহলে ?

সেই রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি মহাদেও, লখিয়া সহ পাঁচজনকে খুন করলুম।

পরদিন সকালে ডাকতেই সবাই হাজির।

আমি চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলুম, আমার এলাকায় কি কি চলবে, কি কি চলবে না। সবাই সে নির্দেশ নতমস্তকে মেনে নিল ॥

০

ধর্মাবতার। ভগবানপ্রসাদের উপাখ্যানের অন্তিমে যে 'আমার' ও 'আমি'র উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা, সেই 'আমার' বোধ ও 'আমিত্ব'ই সমস্ত সমস্যার মূলে, সমস্ত জটিলতার উৎস, এই সভ্যতার স্রষ্টা।

কিন্তু হুজুর, এই 'আমি' টা কে ?

ভগবানপ্রসাদের পিতা ডাকাত ছিলেন। তার পিতামহ, প্র-পিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ……

না, ধর্মাবতার, ভগবানপ্রসাদের অনেকটুকু অতীত আমি জানি নে। বরং আমার কথা বলি, তাতে সত্য উদ্ভাসিত হবে, আপনি স্পষ্টতঃ জানতে পারবেন, 'আমি' কে ?

আগেই বলেছি হুজুর, আমার ঠাকুরমা একজন ডাকসাইটে বেশ্যা ছিলেন। না ভুল হল, তিনি প্রথম যৌবনে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের রক্ষিতা ছিলেন, পরে বেশ্যা।

আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বেশ্যা হয়ে কেউ জন্মায় না,

প্রয়োজনে হয়, দায়ে পড়ে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার ঠাকুরমার অধঃপতনের অংশটুকু আমি আমার পিতার দিনলিপি থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ

> আমার মাতামহ ছিলেন যথার্থ কুলীন বংশোদ্ভব অতিমাত্রায় সম্ভ্রান্ত এক সজ্জন। অতি দুরাদৃষ্টবশতঃ তিনি ক্রমান্বয় ছয় কন্যার পিতা হয়েছিলেন। আমার গর্ভধারিণী তাঁহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা।
>
> চতুর্থ কন্যার সম্প্রদান লগ্নে বরপক্ষের সহিত পাওনা ঘটিত বিরোধের ফলে আমার মাতামহ নিদারুণ উত্তেজিত অবস্থায় অতর্কিতে দমবন্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ফলে আমার চতুর্থ মাতৃস্বসার বিবাহ অনিবার্যভাবে বন্ধ হইয়া যায়। তিন তিনটি বিবাহযোগ্যা কন্যা লইয়া আমার মাতামহী যখন আত্মীয় বিরোধ ও বিষয়জনিত জটিলতায় নিরতিশয় বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত, যখন ছি-ছিক্কারে দেশ ও দিক ঢাকিয়াছে, যখন আমার মাতা ও মাতৃস্বসারা স্থিরনিশ্চয় যে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তাঁহাদের জীবনে স্বপ্ন-সম্ভবের সম্ভাবনা বড়োই সুদূর, তেমনতর ভয়-বিহ্বল মুহূর্তে মরীয়া হইয়া প্রতিবেশী এক বাতুল যুবককে সঙ্গী করিয়া আমার মাতা অসীম সাহসে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অনেক খোঁজখবর করিয়াও কেহ তাঁহার হদিশ পাইলেন না। তিনি তাঁহার আত্মীয়জনের নিকট হইতে হারাইয়া গেলেন। কিন্তু সে অতি অল্প দিনের জন্য। যেইমাত্র তিনি তাঁহার রূপগৌরবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তৎক্ষনাৎ নিজে আড়ালে থাকিয়া তাঁহার এক দূর সম্পর্কের মাতুলের মারফতে সাহায্যের উদার হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। নিরুপায়ের উপায় হইল। আমার দুই মাতৃস্বসার সম্মানজনক বিবাহ হইয়া গেল, মাতামহীও নিশ্চিন্তে বিদায় লইলেন। কিন্তু আমার জননী, গর্ভধারিণী, স্বজনদের

> কাহারও ভালবাসায় ধন্য হইলেন না, কৃতজ্ঞতায়ও না, ঘৃণা
> তাহাকে নিরন্তর তফাতে সরাইয়া রাখিল।

ধর্মাবতার! একসময়ে বিত্তবান মাত্রের-ই রক্ষিতা থাকত। রক্ষিতা রাখতে পারাই ছিল বিত্তবানের অহংকারের অঙ্গ, সামাজিক প্রতিষ্ঠার ভূষণ। তারও আগে হুজুর, বারাঙ্গনাদের প্রচণ্ড সামাজিক মর্যাদা ছিল। ভদ্র গৃহস্থ কন্যাদের কলাপারদর্শিনী করার জন্যে বারাঙ্গনা গৃহে পাঠানোর বিধি ছিল। এমন কি রাজা, মন্ত্রী, সভাসদ্, কবি, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের অবকাশ আলোচনার ক্ষেত্র ছিল বারাঙ্গনা গৃহ। তাঁদের প্রেরণা তথা উৎসাহদাত্রী ছিলেন তারাই। তাও বা কেন, বেদবিহিত পূজা মাত্রের-ই বারাঙ্গনা গৃহাঙ্গনের মৃত্তিকা এক অপরিহার্য উপকরণ। এই স্বীকৃতির মধ্যে এ-সভ্যতার প্রয়োজন উচ্চারিত।

কালে এ পেশা ঘৃণিত হল, কিন্তু পরিত্যক্ত নয়। এও এক মজা। এমন ঘৃণার কাল-ই আমার ঠাকুরমার কাল।

ন্যায়াধীশ! ঘৃণ্য পেশা গ্রহণ করেছিলেন আমার ঠাকুরমা, দায়-দায়িত্বের সবটুকু তাঁরই, তখন আমার পিতা কোথায়? সম্ভবতঃ তিনি তখনো আমার ঠাকুরমার ইচ্ছায়, তবু জন্মের, শুধু জন্মের জন্যে, আমার পিতা নিজেকে আড়াল করার দুঃখে বিব্রত হয়েছেন, বিড়ম্বিত। আজীবন বিরক্ত করেছেন তাঁর সৎ ভাই, যিনি সামাজিক অর্থে বৈধ ও সম্ভ্রান্ত; অথচ এই কলঙ্কিত জন্মের দায় আমার পিতার নয়, কিছুতেই নয়। তবু তিনি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে প্রসারিত করতে পারেন নি; গুটিয়ে নিয়েছিলেন দূর এক শহরের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠার স্বল্প প্রাপ্তির আড়ালে। অথচ জন্মসত্বে মানবিক অধিকারে তাঁরও দাবী ছিল, কিন্তু কিছুতেই তিনি তা ব্যবহার করতে পারেন নি, ফলে তাঁর চলা ব্যহত হয়েছে, তাঁর গতি ধীর। স্বচ্ছন্দ সাংসারিক জীবনের সুখও তাঁর হাত ধরেনি, আকাঙ্ক্ষা সামাজিকতার নীতি-নিগড়ের যূপকাষ্ঠে মাথা কুটে রক্তাক্ত হয়েছে,

দাম্পত্য লাঞ্ছিত ; অবশেষে প্রতিষ্ঠা,—সে যতো সামান্যই হোক, তাকে ধরে রাখতে গিয়ে তিনি আত্মহত্যায় দায়মুক্তি মেনে নিয়েছেন।

ধর্মাবতার ! আমার পিতা ভুল করেছিলেন। তার আগে আমার পিতার দিনলিপির আর একটি অংশ তুলে দিই।

> সুদর্শন কিছুতেই আমার পিছু ছাড়িতেছে না। তাহাকে অদ্যাবধি যাহা ধরিয়া দিয়াছি, যথার্থ হিসাব করিলে তাহার পরিমাণ অবশ্যই লক্ষাধিক হইবে। দান সূত্রে আমার মাতা কিছুতেই অতো মূল্যের সম্পত্তির অধিকার পান নাই। তবু আমি আমার স্বোপার্জিত অর্থ হইতে যথাসাধ্য দিয়া উচ্ছৃঙ্খল তাহার অভাব ঘুচাইতে প্রাণপণ করিয়াছি। কিন্তু ভবি ভুলিবার নহে। সে আমার দুর্বলতার রন্ধ্রপথে সূচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইতে চাহিতেছে। ভাবিয়া দেখিলাম, সুরুতেই প্রশ্রয় দিয়া ভুল করিয়াছি। আমার মানসিক দৈন্য আমাকে তাহার স্বর্ণডিম্ব প্রসবিনী হংসে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু এইভাবে দীর্ঘদিন চলিতে পারে না। সে জানিয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষতি করিবার মনোবল আমার আদৌ নাই, আমি জন্মসূত্রে ভীরু, বড়ো বেশী দুর্বল, সুদর্শন সেই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু এ অসম্ভব। আমি আরো প্রশ্রয় দিতে পারি না, তাহাতে সর্বনাশ ঠেকানো দুঃসাধ্য হইবে।

ধর্মাবতার ! আমার পিতার দিনলিপির আরো একটি অংশ তুলছি ঃ

> সুদর্শন আমার মাতার জীবন, আমার জীবন অতিষ্ঠ করিয়াছে, এক্ষণে সে আমার সহোদরার সর্বনাশও সম্পূর্ণ করিল। জীবনে স্খলন যে আত্মজ ও আত্মজার এমন সর্বনাশের কারণ হইবে আমার মন্দভাগ্য জননী নিশ্চয়ই তাহা কল্পনাও করেন নাই। নতুবা আত্মজাকে দত্তক দিয়া তিনি যে প্রতিষ্ঠার

মুখোমুখী করিয়া দিয়াছিলেন, যে প্রতিষ্ঠার প্রতাপ তাহার শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া সম্পন্ন ঘর ও বরে পরিপূর্ণ সৌভাগ্যে স্থাপন করিয়াছিল, সেই সাজানো সংসারে হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া এমন অঘটন ঘটাইবে কেন যাহা তাহাকে শূন্য-হস্ত ভিখারিণীর ন্যায় পথিমধ্যে দাঁড় করাইয়া দিবে? ইহাতে সুদর্শনের স্পষ্ট প্ররোচনা ছিল। সে প্রায় মুখোমুখী দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে জানাইয়া দিয়াছে আমার সহোদরার সঠিক পরিচয়। বলাবাহুল্য অভিশাপ ছিল, নচেৎ তাহার একমাত্র পুত্রও মূক ও বধির হইবে কেন? তাহার স্বামীর মৃত্যুতে, পুত্রের মূক ও বধিরতায়, তাহার অসহ লাঞ্ছনায়, আমি কোন সান্ত্বনা ধরিয়া দিতে পারি নাই, শুধু নির্লজ্জের মতো পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছি। কি-ই বা করিতে পারিতাম? যে দুঃখে আমি ছিন্ন-বিছিন্ন সে দুঃখ সেও এড়াইতে পারিল না, এই মর্মান্তিকতা অসহ্য হইয়া আমাকে জীবন-বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু আমি জানি, আত্মহত্যা মহাপাপ। অতএব, শেষ অবশ্যই আমাকে দেখিতে হইবে। কিন্তু সব সত্বেও সুদর্শনের সর্বনাশ আমি কিছুতেই করিতে পারিব না : মায়ের নির্দেশও বটে, নিজের কলঙ্কও বটে। যা চাপা আছে তা ক্রমে দিক-বিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে।

জননী গো! এ কোন নির্মন, নির্মম অকূল পাথারে তুমি আমাদের ভাসাইয়া দিয়াছ? বলো, আমরা কি এমন অপরাধ করিয়াছিলাম যে নিরন্তর এই অবর্ণনীয় অপমান ও লাঞ্ছনা, অপরিসীম ঘৃণা ও বিড়ম্বনা শুধুমাত্র প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই নতমস্তকে সহ্য করিতে হইতেছে?

ধর্মাবতার! আমার পিতা সমূহ সর্বনাশের চেহারা আন্দাজ করেও আত্মহত্যা নামক মরীয়া ভুলের ফাঁদে সহজে পা দিয়েছিলেন। কঠিন ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁকে নিশ্চয়ই বিমূঢ় করেছিল। কিন্তু ন্যায়াধীশ!

তাতে যে সর্বনাশ ঠেকানো যায় না, যাবে না, আমার সাহসী পিতা, যিনি পুত্র বয়স্ক হচ্ছে জেনেও ঘৃণ্য পাড়ার কেন্দ্রে বাড়ী ধরে রাখার স্পর্ধা রাখেন, তিনিও বুঝতে পারেন নি। তাঁর অপমৃত্যুতে সর্বনাশ স্বচ্ছন্দে সদর ডিঙিয়ে একেবারে অন্দর গ্রাস করল; তাঁর একমাত্র পুত্রকেও।

হুজুর, ধর্মাবতার, সেই রাতে ময়নাকে আমি আদৌ স্পর্শ করিনি, স্পর্শে উদ্যোগী হয়েছিলুম মাত্র। সে আমার ত্রুটি, সে আমার অনিবার্য অধঃপতন। অথচ শুধুমাত্র উপস্থিতিকে উপলক্ষ্য করে মধ্যরাতে তার ভয়ার্ত আর্তনাদ, বিকট চিৎকার, নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যমূলক। এর আগেও এমনটি আরেক বার ঘটেছিল, কৈ তখন ত সে তা করেনি, বরং অভিজ্ঞা রমণীর কুশলতায় বলেছিল, আপনি যান, আমি আসছি। সে রাতে আমার মুখে-চোখে কামনা কি তার বীভৎসতায় আভাসিত হয়েছিল? আমি জানি না।

ধর্মাবতার, সব সত্ত্বেও আমি বলছি, আমি দোষী। কারণ প্রশস্ত বারান্দা, ডিঙিয়ে, মার ঘর পেরিয়ে ময়নার খুপরি পর্যন্ত ধাওয়া করে ওকে স্পর্শ করার, উপভোগ করার তীব্র, তীক্ষ্ণ ইচ্ছে আমার মধ্যে ছিল। ওর ব্যবহারে যতো প্রলোভনই থাকুক না কেন, যতো প্রলুব্ধ করার চেষ্টাই সে করুক না কেন, এ কিছুতেই আমার পক্ষে সঙ্গত হয়নি। শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত গৃহকর্তা হিসেবে এমন অন্যায়ে মেতে ওঠা আমার নির্লজ্জতাই। এর জন্যে ধিক্কার, তিরস্কার, শাস্তি অবশ্যই আমার প্রাপ্য। কিন্তু হুজুর, যেভাবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সাজানো হয়েছে, যেভাবে ময়নাকে অবোধ, অবলা ও আশ্রিতা বলা হয়েছে, আমার আপত্তি সেখানে এবং এ মিথ্যে, সহস্র বার মিথ্যে, এ মামলা সাজানো, সম্পূর্ণ অভিসন্ধিমূলক। এর পেছনেও সেই তিনি, যাঁর নাম সুদর্শন রায়, যিনি আমার সম্ভ্রান্ত ঠাকুর্দার বৈধ সন্তান।

আশ্চর্য! এই ভদ্রলোক! আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনে তাঁর বিরোধ আসলে কার সঙ্গে? অর্থাৎ তাঁর যথার্থ শত্রু কে? আমার ঠাকুরমা, আমার পিতা, পিসিমা, না আমি?

ধর্মাবতার! আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে শুধু পূর্বপুরুষদের পদবী ও সম্পত্তির অধিকারী হই না, তাঁদের ধর্মাধর্মের, তাঁদের খ্যাতি-অখ্যাতির, তাঁদের পুণ্যাপুণ্য, অভ্যাস-অসুখেরও অধিকারী হই। অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দায়েরও। আবার, আমার আগামী পুত্র-পৌত্রাদির নিশ্চিন্ত, শুভাশুভ ভেবে রাখার দায়ও এই আমার-ই। এই সুদীর্ঘ অতীত ও সুদূর ভবিষ্যতের দায়-দায়িত্বের, টানাপোড়েনের কেন্দ্রে যে আমি, যে আদ্যন্ত রক্তে, সংস্কারে বাঁধা, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের হাত ধরা, সে-আমি কি সত্যই স্বাধীন? তার ইচ্ছে-অনিচ্ছে কি তার-ই? তার আকাঙ্ক্ষায়, স্বপ্নে, বাসনায় অতীত ও ভবিষ্যৎ কি ছায়া শরীর হয়ে নিজেকে বিছিয়ে রাখে না?

তাহলে ন্যায়াধীশ, এই-ই সত্য যদি, তাহলে ব্যক্তি নিয়ে বিব্রত হচ্ছে ওঁরা কারা? স্বাধীকার, স্বাধীনতার কথা অনর্গল উচ্চারণ করছেই বা কেন? স্বাধীন এককের অস্তিত্বই যেখানে নেই সেখানে কৃত দোষের জন্যে একজন-ই বা দায়ী হবে কেন, যখন প্রতিটি মানুষের রক্তে, সংস্কারে, স্বভাবে পূর্বজরাও রয়েছেন।

হুজুর, স্ব-ই নেই তো স্বত্ব?

ধর্মাবতার! এও এক মজা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, আমার হতভাগিনী মায়ের ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমুদায় সম্পত্তির অছি নিযুক্ত হয়েছেন সরকার কাকা। ফলে সুদর্শন রায় ভীষণভাবে জব্দ হয়ে নিরুপায় পিছু হটেছেন।

যে ক্রোধে মূকও মুখর হয়, যে ক্রোধে সরলও বক্র হয়ে ওঠে, সেই

অনির্বান ক্রোধ আমাকে দীর্ঘদিন উত্যক্ত করেছে। একবার মনে হয়েছে, কেন আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি, তার চাইতে অতর্কিত আক্রমণে, নির্মম কুঠারাঘাতে দীর্ঘ-শিকড়, দীর্ঘ-দেহ ওই বিষবৃক্ষের মধ্যদেশ বিদীর্ণ করিনে কেন? কেন প্রতিহিংসার আগুনে সেই নারকীকে দগ্ধ করি না, অথবা প্রকাশ্যে খুন? না ধর্মাবতার! এর কিছুই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মধ্যেও আমার পিতার দ্বিধা ও ভয়। একে জারজ পিতার সন্তান, তদুপরি খুনী! না ন্যায়াধীশ, সে মোটেই সান্ত্বনাদায়ক কিছু নয়, হবে না। ফলে, আমি নিরন্তর তফাতে সরে গেছি যাতে আমার অমানবিক ক্রোধ আমার পরম শত্রুকে কিছুতে বেষ্ঠন করতে না পারে, আমার নির্মম ঘৃণা তাঁকে স্পর্শ। কারণ একসময়ে আমার মনে হয়েছে, আমার এই পিতৃব্যও মন্দ ভাগ্য, তিনিও যথার্থ অসহায় এবং তিনি নিরাপরাধ। কারণ, পিতার উচ্ছৃংখলতাজনিত দাতব্য তাঁকে দরিদ্র করেছে, অস্বচ্ছল। অথচ তাঁর সম্ভ্রান্ত পিতা যদি তা না হতেন, তাহলে, পৈতৃক সমস্ত বিষয়-বিত্তের অধিকার তাঁতেই বর্তাত। কিন্তু তা ঘটেনি। আমার পিতা ছিলেন তাঁর বৈধ পিতার সম্পত্তির অবৈধ ভাগীদার। ধর্মাবতার! এই সমাজে, সভ্যতায় যেখানে বৈধ ভাগীদারকেও যেন-তেন প্রকারেণ পথে দাঁড় করায়, সুযোগে সময়ে সর্বনাশ করতে ছাড়ে না, সেখানে অবৈধ ভাগীদারের বিরুদ্ধে দাঁতে-নখে যুদ্ধে অন্যায় ত করেন নি। তিনি যা যা করেছেন আজ মনে হয়, সবই যথার্থ। তাঁর বিরুদ্ধতা এই সমাজসম্মত, সভ্যতানুমোদিত। অতএব, সজ্ঞানে, সানন্দে বলছি, তিনিও নির্দোষ।

ধর্মাবতার! অতঃপর আমার সবিনয় নিবেদন, আমি আমার পিতার, আমার পিতামহের, আমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের, আমার মা, ঠাকুর মা, দিদিমা, সেই আদি মানব থেকে অদ্যাবধি পুরুষানুক্রমিক মানুষের কৃত সমস্ত অপরাধের, অন্যায়ের, কালে কালে অর্জিত সব তথাকথিত পাপের দায় ও দায়িত্ব সানন্দে মাথা পেতে নিতে ইচ্ছুক; তার জন্যে

সভ্যতার তথাকথিত আইনানুমোদিত সবচেয়ে নির্মম, সব চাইতে কঠোরতম দণ্ডও। বিশ্বাস করুন, এ মুহূর্তে অন্য কোন প্রার্থনা আমার নেই, আমি নিয়ে আসিনি। অবশ্য নিজের প্রতি নিরতিশয় মমতাবশতঃ জবানবন্দীর সুরুতে আমি দু দুবার বেশ জোরের সঙ্গেই উচ্চারণ করেছি, মৃত্যু আমার কিছুতেই কাম্য নয়; জীবনের বিনিময়ে কোন সন্ধি করতে আমি অরাজী।

কিন্তু ধর্মাবতার, আমার হতভাগ্য পিতার দিনলিপির অংশ বিশেষ পাঠ সম্পূর্ণ করলে, আমি স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ করলুম আপনার ওই অনিন্দ্য মুখ আপনার-ই চোখের জলে সিক্ত; বুঝলুম ধর্মের, ন্যায়ের, সত্যের আসনে বসেও আপনি কতো অসহায়। দেখলুম, লাঞ্ছিত ও অপমানিত মানবাত্মার দুর্ভাগ্যে আপনিও অতিমাত্রায় বিমূঢ়, বিহ্বল।

ধর্মাবতার! এই স্বতঃপ্রকাশে আপনার নিরপেক্ষতা অবশ্যই ব্যাহত হয়েছে। ধরা পড়েছে, আপনি অভিযুক্তের প্রতি যথার্থ কঠোর নন; ফলে, আপনার অসহায়তা আপনার মুখাবয়বে দ্বিধার চিহ্ন রেখেছে। আমি জানি, এ মুহূর্তে আপনার পক্ষে পক্ষপাতহীন রায় দান অসম্ভব।

অতএব ন্যায়াধীশ! আমি সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়, কারো ভয়ে বা প্ররোচনায় নয়, কারো প্রতি ক্রোধে বা অভিমানে নয়, কারো প্রতি সহানুভূতি বা মমতায় নয়, একান্তভাবে আপন বিবেকের নির্দেশে অদ্যাবধি কৃত সমস্ত অপরাধের ন্যায্য শাস্তি যা আমাকেই বহন করতে হবে, আমি তা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করছি। ধর্মাবতার! আপনি যথাযথ লিপিবদ্ধ করুন।

ভগবানপ্রসাদ! যে প্রচণ্ড বিশ্বাসে তুমি এই উপত্যকায় অনন্ত প্রাণের প্রবাহকে আহ্বান করে এনেছিলে, সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ-প্রবাহ তোমার-ই অলজ্জ অহংকারে, তোমার দুর্মর লোভে, তোমার উন্মত্ত পাপে, তোমার-ই স্বার্থদুষ্ট

অধর্ম ও অন্যায়ে এমনই সর্বনাশ ডেকে এনেছে যে, এ মুহূর্তে আমার গা গুলোন কিছুতেই থামতে চাইছে না ; আমার অদম্য বমনেচ্ছা ক্রমে বাড়ছে, মনে হচ্ছে তোমার-ই লোভে-পাপে রম্য এই উপত্যকা এখুনিই ক্লেদাক্ত হবে, ভেসে যাবে। অতএব ভগবানপ্রসাদ! তুমি প্রস্তুত হও, আমাদের সম্মিলিত ঘৃণা তোমাকে অবশ্যই আসনচ্যুত করবে, করবেই। তার আগে, আমি তোমার, তোমার উত্তরাধিকারীদের কৃত পাপের জন্য, মিলিত ক্রমান্বয় অপরাধের জন্য, আমি জানি, মৃত্যুদণ্ডও অতি অল্প ; তবু এ মুহূর্তে নিষ্ঠুর মৃত্যু হাঁকা ছাড়া আমার হাতে আর কোন ক্ষুরধার অস্ত্র নেই যা তোমাকে বিদ্ধ করবে ; তোমার আত্মস্বার্থ প্রণোদিত নির্দেশ, আদেশ ও অধিকারকে স্তব্ধ করবে। অতএব ভগবানপ্রসাদ, আমি, আবহমান জীবনের স্বার্থে, দূরযাত্রী মানুষের স্বার্থে তাঁদের অদ্যাবধি অপ্রাপ্য সুখ ও স্বাধীনতার স্বার্থে—তাঁদের মুখোমুখী নতজানু আমি, এই আদেশ দিচ্ছি যে তোমাকে ততক্ষণই গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে যতোক্ষণ না তোমার হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটায়। এ দণ্ড অবশ্যই অপরিবর্তনীয়।

এবং—

ভগবানপ্রসাদ! তোমার স্বার্থান্ধ আদেশে-নির্দেশে বিমূঢ় আমি, আমার এ জীবন, বড়ো বেশি লাঞ্ছিত ও অপমানিত। ইতিমধ্যেই আমার এ জীবন দুর্বহ ও দুঃসহ হয়ে উঠেছে, একে আরো টেনে চলা অর্থহীন, অনর্থক বহনের কষ্টে বিব্রত হওয়া। তাই, তোমার-ই উচ্চারিত ন্যায়-নীতির জগতে আমার মৃত্যুই আমার একমাত্র শাস্তি। আমি সে শাস্তি সানন্দে উচ্চারণ করছি।

ধর্মাবতার! আমার তরফের বক্তব্য শেষ হলো। এখন আপনি আদেশ

দিন আমার কর্তব্য কি ? আমাকে আরো কতোক্ষণ এই জীবন নিয়ে অনাবশ্যক প্রহর গুণতে হবে ? আমি কিন্তু নিরন্তর অসম যুদ্ধে লড়ে লড়ে বড়ো বেশী ক্লান্ত, অবসন্ন, নিঃস্ব। দীর্ঘদিনের যে দায় আমাকে অনুক্ষণ তাড়া করে এন্দূর ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে, এ মুহূর্তে আমি সে দায় মুক্ত। আমার আর কোন ক্ষোভ নেই, ক্রোধ ; আমি আর আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করবো না। এ মুহূর্তে অর্জিত স্বস্তির মধ্যে আমি এক সর্বময় শান্তি, তৃপ্তি ও সুখ অনুভব করছি। আরো অপেক্ষায় আমার ভীষণ অনিচ্ছা, আপনি অনুমতি দিন, আমি এবার ঘুমোব, যে ঘুম অনন্ত কালের মধ্যে আর কোনোদিন ভাঙবে না, কেউ-ই ভাঙাতে পারবে না।

ধর্মাবতার। অনেকবার ভেবেছি, এই যে এতোকাল জেগে রইলুম এতে কি লাভ হলো, কি পেলুম ? অথচ এ জীবন একটাই, একবার-ই— কতো সম্ভাবনাই তো চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো ; এই এক জীবনে কত কিছুই না সম্ভব হতে পারতো, অথচ তার কিছুই হতভাগ্য আমার হাত ধরলো না ; শুধু একরাশ কান্না, দুঃখ, যন্ত্রণায় রক্তাক্ত আমার এখন শূন্য হাত, আমি ফিরে যাচ্ছি। কেনই বা এসেছিলুম ? কেনই বা যাচ্ছি ? হুজুর, এ মজা অসহ্য। আমাকে যেতে দিন।

মহানুভব ধর্মাবতার ! আপনি অনুমতি দিলেন। আমি ধন্য। আমার জন্মের কৃতজ্ঞতা আপনাকে বেষ্টন করুক, আমার মৃত্যুর আনন্দ আপনাকে সিক্ত করুক, এবং আমার আজন্মের দুঃখকে বহন করে আমি এ জীবনের বিশাল প্রান্তর পেরিয়ে যাচ্ছি। বিদায় পৃথিবী, বিদায়।

ন্যায়াধীশ! আপনি ত একবারও আমার নাম জিজ্ঞেস করেন নি ? আপনি কি সত্যিই ভুলেছিলেন, নাকি এ ভুল আপনার ইচ্ছাকৃত ? নাকি আপনি জানেন-ই যে, আমি—

আপনি হাসছেন ? হাসুন।

ধর্মাবতার। এই মন্দভাগ্য মানবসন্তানের নাম, অমৃত ॥

॥ নতজানু সমাপ্ত ॥